শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প

শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প

শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প

সেরা গল্পের সংকলন

পুস্তকালয়

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড ● কলকাতা ৭

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া
১৩৯১

সম্পাদনা
সত্যজিৎ সেন

প্রকাশক
শ্রীনির্মলকুমার সাহা
পুস্তকালয়
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৭

মুদ্রক
সনাতন সাঁতরা
দি সারদা প্রিণ্টার্স
১৫ কানাই ধর লেন
কলকাতা ৭০০০১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শ্রীধীরেন শাসমল

দাম : দশ টাকা

হাসতে হাসতে যারা
কান্নাকে
জয় করতে পারে
তাদের জন্যে

কোন পাতায় কি আছে

মাখন বিলাসী	:	আশাপূর্ণা দেবী	১
কোগ্রামের মধু মণ্ডিত	:	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৩
ফুলি চললো ফিলিমে	:	পূর্ণেন্দু পত্রী	২১
পেশা বদল	:	লীলা মজুমদার	২৭
টুনুদা	:	বিমল কর	৪০
দাদুর বেড়াল	:	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	৪৬
দুই মূর্তি	:	শক্তিপদ রাজগুরু	৬৫
ঘুম নিয়ে তেঁতুলমামার ঘুম নেই	:	হিমানীশ গোস্বামী	৮১

কিছু কথা

হাসির গল্প লিখতে পারেন না সবাই। যাঁরা পারেন সাহিত্য তাঁদের নিয়ে ধন্য হয়। কি ছোটদের, কি বড়দের, হাসির গল্প দারুণ আকর্ষণ করে সবাইকে। বাংলা ভাষায় এই একালে, সব বয়সের সবার জন্যে যে ক'টি হাসির গল্প লেখা হয়েছে তা আঙুলে গোনা যায়। আমরা আবার তার মধ্যেও বাছাই করে সবচেয়ে সেরা ক'টিকেই সাজিয়ে দিয়েছি এই সংকলনের পাতায় পাতায়। কোনো রসিক পাঠকের একটুখানি মুচকি হিঃ হিঃ যদি দমফাটা হাসির অ্যাটম হয়ে হঠাৎ ফেটে পড়ে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব।

মাখন বিলাসী

আশাপূর্ণা দেবী

এ গল্পটা আমার বানানো নয়, সত্যি গল্প। বলেছিল আমার ভাগ্নে নিত্যহরি। বলেছিল—

ভোজন বিলাসী অনেকেই থাকে। ভোজনের ব্যাপারে খুঁৎ ঘটলে খুঁৎ-খুঁতুনির আর অন্ত থাকে না তাদের। তেমন তেমন হলে তো খুনই চেপে যায় মাথায়।

যেমন হয়েছিল আমাদের গ্রামের একদার জমিদার বংশধর শ্যামরতন গাঙ্গুলীর। শ্যামরতনের ফাঁসিতে লটকাবার কারণই তো ওই।

ভোজন বিলাস!

না, ফাঁসির খাওয়া খেয়ে মরেন নি শ্যামরতন, তেমন স্থূল বিলাস ছিল না তাঁর, ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার। শ্যামরতনের নাক আর জিভ ছিল আনবিক শক্তিসম্পন্ন। শ্যামরতন ভাত খেয়ে ধরে ফেলতে পারতেন ওই ভাতের চালের জন্মস্থান কোনো শ্মশানের ধারে-কাছের ধান ক্ষেত কিনা। কারণ তেমন হলে তিনি নাকি ভাতে মড়াপোড়া মড়াপোড়া গন্ধ পেতেন। পায়েস খেয়ে ধরতে পারতেন শ্যামরতন সেই পায়েসের দুধের উৎসস্থল গো-মাতাটি ঘাস খেয়েছিল না বেলপাতা খেয়েছিল। বেলপাতা খেলে শ্যামরতন পায়েসে তিক্তস্বাদ পেতেন।

সেই আনবিক অনুভূতিই কাল হয়েছিল তাঁর!

একদিন খেতে বসে মাছের কালিয়ার মাছে পেঁকো-পুকুরের গন্ধ পেলেন শ্যামরতন। ব্যস্, হাত গুটিয়ে ডাক পাঠালেন মাছওলা জেলেকে। তারপর জেরার ওপর জেরা, কোন পুকুরের মাছ ইত্যাদি।

জেলে ছোকরাও একদার প্রজার বংশধর, কিন্তু এখন তাদের ইউনিয়ন হয়েছে, তাই জেরার মুখে চোটপাট জবাব দিয়ে বসলো, হ্যাঁ, পাঁকের পুকুরের মাছই বটে। তা' করবে কি, পুকুরের পাঁকের জন্যে তো আর সে দায়ী নয়।

আর যায় কোথায়!

একে দুপুরের ভোজটি গুবলেট, তায় আবার চোটপাট জবাব, ধাঁই করে হাতের কাছের ভারী কাঁসার গেলাশটা ছুঁড়ে বসলেন শ্যামরতন, আর বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা, গেলাশ খেয়ে ছোকরা সেই যে রগ চেপে বসে পড়লো, আর উঠল না।

একবাড়ি লোক সাক্ষী, পালাবার পথ রইল না, ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হলো শ্যামরতনকে।

তা' শ্যামরতনের মতন অতো কড়া না হলেও ভোজন বিলাসী অনেক আছে। ওটা অনেকের দেখা। আবার শয়ন বিলাসীও আছে ঢের।

শয়ন বিলাসীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। মশারির বাইরে মশা ঘুরলেও ঘুম ভেঙে যায়, তোষকের নিচে একগাছা চুল থাকলেও ঘুম আসে না, এমন লোক আমার নিজের চোখেই দেখা। এরা জীবনে কখনো শত প্রয়োজনেও অপর কারো বাড়িতে রাত্রিবাস করতে পারে না। এরা শয়ন বিলাসে হানি ঘটবার ভয়ে নিকট আত্মীয়ের ব্যাপারেও রাতের মড়ায় কাঁধ দেয় না, দূরপাল্লায় বিয়েবাড়ি যায় না, আর সাত জন্মেও ভ্রমণে-ট্রমনে বেরোয় না।

রেলগাড়ি এদের কাছে বাঘ!

এরা অদ্ভুত, তবু এরা সমাজ-মান্য ব্যক্তি, এদের পরিচয় অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। 'ভোজন বিলাসী' 'শয়ন বিলাসী' এ-সব শব্দ অভিধানে আছে।

কিন্তু 'মাখন বিলাসী'?

আছে এ-শব্দ অভিধানে?

নাঃ, আমি তো দেখি নি। 'চলন্তিকা' থেকে শুরু করে ঠাকুর্দার

আমলের সেই সাড়ে-বারোসের ওজনের 'বৃহৎ সটীক বঙ্গাভিধান' পর্যন্ত সব হাতড়ে দেখেছি। কোথাও পাই নি এ-শব্দ।

তার মানে আমাদের চাটুয্যেদা স্রেফ স্বয়ম্ভূ।

তবে চাটুয্যেদার এ পরিচয় আমাদের এই পিক্‌নিকের আগের দিন পর্যন্ত জানা ছিল না। গোলা গেরস্ত লোক আমরা, কে বা কবে পিক্‌নিক করেছে: কিন্তু কুঁজোরও তো কখনো-সখনো চিৎ হয়ে শুতে সাধ যায়! তাই আমাদের এই ভোঁদর অফিসের কেরাণীদেরও পিক্‌নিকের শখ।

বারাসতে একজন বড়লোকের একখানা 'আরামকুঞ্জ' জোগাড় করা হলো—কোনো একজনের বন্ধুর বন্ধুর তুতোর তুতো মারফৎ। তারপর উৎসাহের ঘটায় পকেট হালকা করে চাঁদাও উঠিয়ে ফেলা হলো অনেক। অতঃপর ফর্দ লেখা আর পরিকল্পনা চলতে লাগলো বেশ ক'দিন ধরে। উৎসাহের চোটে বুড়োরাও তরুণ হয়ে উঠলো যেন। এরই মাঝখানে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! চাটুয্যেদা বলে বসলো, ছ্যাখ্ বাপু, আমার বোধহয় যাওয়া হবে না।'

যাওয়া হবে না!

কথাটা শুনে ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগে গেল যেন।

সকলে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'যাওয়া হবে না মানে?'

'মানে?' চাটুয্যেদা একটু লাজুক হাসি হেসে বললো, 'আমার একটু ইয়ে, মানে একটা বদভ্যাস আছে, তোদের তো বলছিস সকাল বেলাই বেরোনো—কাজেই—'

'বদভ্যাস! তোমার আবার বদভ্যাসটা কী? নেশা-টেশা কর নাকি সকাল বেলা?'

রেগে বলি আমরা।

চাটুয্যেদা তেমনি লাজুক হেসে বলে, 'তা সে একরকম নেশাই। মানে আমি হচ্ছি বুঝলি, একটু মাখন বিলাসী।'

'মাখন বিলাসী! বুঝলাম না!'

'তার মানে?'

'ও হো-হো, সকাল বেলা মাখন খাওয়ার অভ্যাস আছে? হরিনারায়ণ মধুসূদন! এই তোমার সমস্যা?'

মাথা থেকে পাহাড় নামে আমাদের।

সমস্বরে বলি, 'খেও-না বাবা, যতো পারো মাখন খেও। বলো, ক' কিলো মাখন নিয়ে যাবো তোমার জন্যে?'

চাটুয্যেদা মাথা নেড়ে বলে, 'না রে বাবা না, খাওয়া-ফাওয়া না! মাখা। যেমন ভোজন, শয়ন, তেমনি আর কি! সকাল বেলা আমি একটু তেল মাখি।'

'তেল মাখো! তা, সেটা আবার একটা ভাববার কথা না কি? কে না মাখে? কখন মাখো?'

'এই মানে সারা সকালটাই! চা খাওয়ার পর থেকে অফিস যাবার আগে পর্যন্ত।'

আমরা অবাক না হয়ে পারি না

বলি, 'সারা সকাল ধরে শুধু তেল মাখো? রোজ?'

'বললাম তো বাপু, আমি একটু মাখন বিলাসী! আমাকে তোরা পিক্‌নিক থেকে বাদ দে।'

চাটুয্যেদাকে বাদ!

যে চাটুয্যেদা চাঁদা দিয়েছে সব থেকে বেশী!

আমিই আবার কর্মকর্তা দি প্রধান কিনা, তাই তেড়ে উঠে বলি, 'বাদ? অসম্ভব কথা বোলো না চাটুয্যেদা! সারা সকালই তেল মেখো তুমি বাবা! যতোক্ষণ না খিচুড়ি, মাংস নামে ততোক্ষণ ধরেই মেখো। মোটকথা, বাদ কাউকেই দেওয়া হবে না। তোমায় তো প্রশ্নের বাইরে।'

চাটুয্যেদা অন্যমনা গলায় বলে, 'তাই বলছিস?'

'বলছিই তো!'

'বেশ ঠিক আছে। তোদের যখন এতো ইচ্ছে! রওনাটা কখন?'

'ওই তো ভোর সাড়ে পাঁচটায়! অফিস ভ্যানটাই পাওয়া যাবে, বলে রেখেছি ড্রাইভারকে। রোজ যেমন যেমন সবাইকে তোলে সেই-

ভাবে তুলে শ্যামবাজার থেকে মাংস, মিষ্টি আর দই কিনে সোজা এগিয়ে যাওয়া।'

'এতো সব করবি ?'

চাটুয্যেদা বিপন্নভাবে বলে, 'পৌঁছতে তো তা'হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে !'

'দেরী আবার কিসের ? শ্যামবাজার থেকে বারাসত আবার কতোটুকু ? সাড়ে ছটার মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

'ঠিক আছে।'

এবার চাটুয্যেদার কণ্ঠ প্রীত।

'তাহলে আর অসুবিধে নেই। সাড়ে ছটাতেই শুরু করি আমি। ওটাই আমার টাইম।'

কিন্তু কে জানতো চাটুয্যেদার 'সুবিধে অসুবিধের' আর 'টাইমের' কাঁটা স্যাকরার দোকানের নিক্তির কাঁটা !

যতোই হোক বেড়ানোর ব্যাপার তো ! অফিস টাইমের মতো মার মার কাট কাট কী হয় ? হয় না। পাঁচজনের দরজায় পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে দাঁড়াতেই দেরী। চাটুয্যেদার দরজায় গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন ছটা বাজে।

জোরে জোরে হাঁক পাড়ি, 'চাটুয্যেদা, বেরিয়ে এসো।'

বেরিয়ে আসে চাটুয্যেদা।

খালি গা, পরনে লুঙ্গি।

'এ কী চাটুয্যেদা ? এখনো তৈরী হও নি ?'

'হয়েছিলাম !' চাটুয্যেদা নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'ছেড়ে ফেললাম ! তোদের তো বিস্তর দেরী হয়ে গেল।'

'বিস্তর দেরী ? কই না তো ? মাত্র তো সাড়ে পাঁচটার জায়গায় ছটা। সাত ঘাটের মাছ এক ঘাটে করা, আধ ঘণ্টাটাক দেরী আর এমন কি ? নাও নাও, জামাটা গায়ে দিয়ে এসো।'

'নাঃ !'

চাটুয্যেদা অঙ্ক কষার ভঙ্গীতে বলে, 'এখান থেকে তোরা এখনো গ্রে

স্ট্রীট থেকে চৌধুরীকে নিবি, তারপর শ্যামবাজার থেকে মাংস কিনবি, দই-মিষ্টি কিনবি, তারপর—ওঃ, অসম্ভব। সাড়ে ছটা তো বাজবেই বাজবে। টাইম পার হয়ে যাবে!'

'কী মুস্কিল! তেল মাখা তো আর ক্যাপসুল খাওয়া নয় গো, না হয় আধঘণ্টা দেরীই হলো।'

'পাগল!' চাটুয্যেদা মাথা নাড়ে, 'তা হয় না।'

অন্যপথ ধরি। বলি, 'তার মানে আধঘণ্টা দেরীর জন্যে তুমি আমাদের এতবড় একটি শাস্তি দিচ্ছো?'

এবার যেন একটু কাজ হয়।

মানে, আসলে তো লোকটা ভালো, ওই 'মাখন বিলাস'ই ওকে উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে।

বিব্রতভাবে বলে চাটুয্যেদা, 'আঃ, ছি ছি! এ কী বলছিস! মানে ব্যাপারটা কী জানিস?'

'জানি, সব জানি। তুমি উঠে এসো তো। নচেৎ ওই খালি গা অবস্থাতেই তোমায় আমরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাবো।'

আমাদের এই ডাকাতি মনোভাব দেখে বোধকরি ভয় হয় লোকটার। তাড়াতাড়ি বলে, 'না বাবা না, জামা পরে আসছি। তবে ব্যাপারটা কী জানিস?'

আমরা সমস্বরে বলি, 'জানি জানি। তুমি একটু মাখন বিলাসী এই তো। আমরা সবাই মিলে না হয় চাঁদা করে তোমায় তেল মাখিয়ে দেব। হলো তো?'

কিন্তু প্রশ্ন তো মাখিয়ে দেওয়ার নয়, প্রশ্ন হচ্ছে টাইমের। চাটুয্যেদার সেই টাইমটা হচ্ছে সাড়ে ছটা। যখন আমরা মাংসের দোকানে বকাবকি, চেঁচামেচি জুড়েছি। জুড়তে তো হবেই নইলে আর পিক্‌নিকের আমোদটা কী? চল্লিশ না হলেও চব্বিশটা দস্যু তো ঝাঁপিয়ে পড়েছি গিয়ে দোকানে। ফুর্তির বান ডাকছে তখন। অতএব দোকানীকে নিয়েই মস্করা-ঠাট্টা, 'কী বাবা? পাঁঠার গলা না কেটে আমাদের গলাগুলোই কাটছ যে! ও কী ওজন হচ্ছে? বলি মেটেগুলো

সরাচ্ছো কেন ? বেশী দামে বেচবে বলে ?···ওহে ভাই, পাঁঠাটা বোকা পাঁঠা নয় তো ? দেখো খেয়ে আবার সবাই মিলে বোকা হয়ে না যাই, ···ইত্যাদি প্রভৃতি বুনো গাঁইয়া রসিকতা। ···কসাইয়ের সঙ্গে আর কীই বা উচ্চাঙ্গের রসিকতা হবে !

একই পদ্ধতিতে দই-মিষ্টি, মিঠে পান, কলাপাতা ইত্যাদি কিনে উল্লাসধ্বনি করতে করতে আমরা যখন বারাসতের সেই আরামকুঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আটটা দশ। দেখি চাটুয্যেদা মলিন মুখে নির্জীবের মতো বসে পড়েছে একপাশে।

জোর গলায় বলি, 'কই চাটুয্যেদা লেগে যাও ?'

চাটুয্যেদা সর্বহারা গলায় বলে ওঠে, 'আর লেগে যাওয়া। দু'দিক থেকে সর্বনাশ হয়ে গেলো।'

'দু'দিক থেকে সর্বনাশ ! সেটা কী জিনিস !'

'কী আবার ? একদিকে দেড়ঘণ্টা লেট, অপরদিকে আমাদের তাড়নায় তেলের শিশি আনতে ভুল !'

'তেলের শিশি !'

'কী তেল তুমি গায়ে মাখো চাটুয্যেদা ?'

'গায়ে আর কী তেল মাখবো ? সরষের তেলই মাখি।'

'তবে ? তবে চিন্তাটা কিসের ? রান্নার জন্যে তো আমাদের পাঁচসেরি টিন এসেছে।'

'তাতে আর আমার কী কাঁচকলা ?' চাটুয্যেদা উদাত্ত গলায় বলে, 'তার তো এক ভাগ সরষে আর তিনভাগ ভেজাল !'

'বল কী চাটুয্যেদা, আমরা কি কলের তেল এনেছি ? গণেশ তেলের টিন—।'

'আরে রেখে দে তোদের কার্ত্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী !'

চাটুয্যেদা এবার খিঁচিয়ে ওঠে, 'দেখতে আর বাকি নেই কাউকে ! মূলোর রস আর লঙ্কা গুঁড়োর ঝাঁজের ভেজাল মেরে—'

'তাহলে তুমি কী তেল মাখো ?'

হতাশ হয়ে বলি।

'কী তেল ?' চাটুয্যেদা গর্বিত ভঙ্গীতে বলে, 'খাঁটি রাই সরষে কিনে বাড়িতে পিষে তেল তৈরী করে নিই। মানে তোদের বৌদি করে দেয়।'

'তার মানে, তোমার মাখন বিলাসের দাপটে বেচারা বৌদির হাড়ও পেষে ?'

'হাড় আবার পেষা কী ?' চাটুয্যেদা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'হিন্দুনারী স্বামীর জন্যে এটুকু করবে না ? আর কতোই বা তেল মাখি আমি ? দৈনিক তো মাত্র আধপোয়া।'

'আধপোয়া ! আধপোয়া করে তেল মাখো তুমি !'

চাটুয্যেদা করুণ স্বরে বলে, 'ওর বেশী আর কোথায় পাবো বল্ ?'

'পাওয়ার কথা হচ্ছে না। অফিসের বেলায়—'

'অফিসের বেলায় তা কি ? ওই তেলটুকুর জোরেই তো দাঁড়িয়ে আছি। তোদের পাল্লায় পড়ে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল। এমন তাড়া দিলি।'

আমরা জোর দিয়ে বলি, 'একটা দিন গণেশ মাখলে কিছু নাশ হবে না চাটুয্যেদা, তোমার সোনার কান্তি সোনারই থাকবে। এসো টিন খুলি।'

কিন্তু টিন খুললে আর কী হবে ? মন খোলে কই ? মনে যে সীল মারা। জব্বর সীল।

মাটির গেলাসের এক গেলাস তেল নিয়ে বসে তো পড়ে চাটুয্যেদা, কিন্তু মাখে কই ? বারবার কেবল নাকের কাছে তোলে আর নাকটা কুঁচকে নামিয়ে রাখে।

'কী হলো চাটুয্যেদা ? শুরু করো।'

'শুরু ? ভাবছি—

চাটুয্যেদা হঠাৎ যাকে বলে নিদ্রোত্থিতের মতো চমকে উঠে বলে, 'তোদের ওদিকে কদ্দুর ?'

'এই তো উনুনে আগুন পড়লো।'

'রান্নার মেনুটা কী ?'

'রান্নার ? খিচুড়ি, মাংস, আলুরদম, পাঁপরভাজা, চাটনী !'

'ঠিক আছে !'

চাটুয্যেদা উল্লাসের গলায় বলে, 'হয়ে যাবে। তোদের হতে হতে আমি এসে যাবো।'

'কোথা থেকে এসে যাবে ?' আমরা হাঁ।

'তেলটা নিয়ে বাড়ি থেকে।' প্রসন্নবদনে উদাত্ত গলায় বলে ওঠে চাটুয্যেদা।

'তেলটা নিয়ে বাড়ি থেকে ! মানে পার্ক সার্কাস থেকে ! চাটুয্যেদা, তুমি আমাদের সঙ্গে মস্করা করছো, না পাগল হয়ে গিয়েছো ?'

'আরে বাবা, মস্করাও নয়—পাগলও নয়, দিব্যি শাদা বাংলাই বলছি। দেখ না, যাবো আর আসবো।'

'বারাসত থেকে পার্ক সার্কাস, তুমি যাবে আর আসবে ?'

'আরে বাবা দেখ না। তোদের হাতের রান্না তো ! তার মধ্যে তিনবার যাওয়া আসা হয়ে যাবে।'

'চাটুয্যেদা, পাগলামী করো না।'

'কী মুস্কিল ! পাগলামীও নয়, মাতলামীও নয়, স্রেফ শাদা বাংলা।'

'কিন্তু তোমার টাইম ?'

'সে তো অনেকক্ষণ আগেই ব্রহ্মপুত্রের জলে তলিয়ে গেছে। এখন আর একটা দিক রক্ষে করার চেষ্টা করতে হবে তো ? মূলোর রসটা না মেখে একটু খাঁটি তেল—'

জুতোটা পায়ে গলিয়ে বীরবিক্রমে এগিয়ে যায় চাটুয্যেদা আলো-আলো মুখে।

চব্বিশজন দস্যু চব্বিশ দ্বিগুণে আটচল্লিশ বার বারণ করলাম, চাটুয্যেদা অটল।

'অতো ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? দেখ না, যাবো আর আসবো।'

তারপর আর কি !

গেছে, আর আসছে—মানে আসছেন। মাংস নামলো, খিচুড়ি নামলো, আলুরদম, চাটনী সব নামলো, চাটুয্যেদার দেখা নেই।

এদিকে উনুন নিবে আসছে। তার সঙ্গে উৎসাহও।

তবে পাঁপরগুলোও ভাজা হোক। নে-ভাগনার প্রস্তাব। উত্তর—হোক!

পাঁপরগুলো তো নেতিয়ে যাচ্ছে, তবে পাতাগুলো পাতা হোক। উত্তর—হোক।

মাংসটা ততোক্ষণ ভাগ করা হোক!

—হোক।

কী করা যায় অতঃপর?

খিচুড়িটা হাতা হাতা পাতায় দেওয়া হোক।—হোক!

দু' একজন বাদে বাকি সবাই বসে পড়া হোক।—হোক। পেট তো চুঁই-চুঁই। খাওয়া আরম্ভ হোক!

—হোক!

গোড়ায় না হয় একটু একটু চাটনী চাটা হোক।

—তাই হোক।

আরও কিছুক্ষণ পরে—বাকি জনেদের যখন পেট কাঁদছে! প্রস্তাব হলো কাক এসে ছড়াছড়ি করছে, বাকি জনেরাও বসে পড়ুক!

—পড়ুক। আর অপেক্ষার মানে হয় না। মানে হয় না।

কী কেলেঙ্কারী! কী কেলেঙ্কারী!

কী যাচ্ছেতাই! কী যাচ্ছেতাই!

কী হোপলেস। কী হোপলেস!

ব্রেণের ডিফেক্ট আছে।···নির্ঘাৎ!

স্ক্রু ঢিলে আছে···নিশ্চয়।

বৌদি ছাড়ে নি, বোধ হয়।

তাই সম্ভব।

খেয়ে-দেয়ে ঘুম মারছে!

তাই সম্ভব!

যাবার সময় ওর ভাগের খাবারটা গাড়িতে তুলে নিয়ে ওর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হোক।

—হোক !

ডেকচির তলা চেঁচেপুঁছে যখন দই-মিষ্টির খালি হাঁড়িতে ভরে ফেলা হয়েছে, তখন হঠাৎ ওদিকে কোথায় সোরগোল ওঠে।—'এসেছে এসেছে !'

'কে এসেছে ? ড্রাইভার ?'

'আরে ড্রাইভারের জন্যে কে মরছে ! এসেছে চাটুয্যেদা।'

এই মার সেই মার করে তেড়ে যাই আমরা, 'এই তোমার যাবো আর আসবো ?'

চাটুয্যেদা লাজুক হাসি হেসে বলে, 'তেলটা হাতে নিয়েই দারুণ লোভ এসে গেল বুঝলি ? ভাবলাম মেখেই যাই। মানে আর কি—'

কিন্তু কে তখন তার মানে কানে নেয় ? সামান্য একটু তেল মাখার জন্যে নিজের তো বটেই ; এতগুলো লোকের আমোদ মাটি করলে তুমি ? এই অভিযোগ নিয়ে তো ঝাঁপিয়ে পড়েছি সবাই একযোগে।

চাটুয্যেদা নির্বিকার !

আলো-আলো মুখে বলে, 'সামান্য কি অসামান্য সে তোরা কি বুঝবি ? অতোক্ষণ বিরহের পর শিশিটা দেখে ফুর্তির চোটে তিন দিনের তেল এক দিনেই মেখে ফেললাম ! বলেই তো ছিলাম বাপু, আমি একটু মাখন বিলাসী।'

কোগ্রামের মধু পণ্ডিত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিপদে পড়লে লোকে বলে, 'ত্রাহি মধুসূদন।'

তা কোগ্রামের লোকেরাও তাই বলত। কিন্তু তারা কথাটা বলত মধুসূদন পণ্ডিতকে। বাস্তবিক মধুসূদন ছিল কোগ্রামের মানুষদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। যেমনি বামনাই তেজ, তেমনি সর্ববিদ্যাবিশারদ। চিকিৎসা জানতেন, বিজ্ঞান জানতেন, চাষবাস জানতেন, মারণ উচাটন জানতেন, তাঁর আমলে গাঁয়ের লোক মরত না।

সাঁঝের বেলা একদিন কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগী বগলাবাবু মধুসূদনের বাড়িতে পাঁচন আনতে গেছেন। গিয়ে দেখেন গোটা চারেক মুশকো চেহারার গোঁফওয়ালা লোক উঠানে হ্যারিকেনের আলোয় খেতে বসেছে আর মধু-গিন্নী তাদের পরিবেশন করছে। লোকগুলোর চেহারা ডাকাতের মতো, চোখ চারদিকে ঘুরছে, পাশে পেল্লায় পেল্লায় চারটে কাঁটাওলা মুগুর রাখা।

মধু পণ্ডিত বগলাবাবুকে বলল, ওই চারজন অনেক দূর থেকে এসেছে তো, আবার এক্ষুণি ফিরে যাবে, অনেকটা রাস্তা, তাই খাইয়ে দিচ্ছি।

কথাটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। মধু পণ্ডিতের বাড়ির উনুনকে সবাই বলে রাবণের চিতা। জ্বলছে তো জ্বলছেই, অতিথিরও কামাই নেই, অতিথি সৎকারেরও বিরাম নেই। বগলাবাবু বললেন, তা ভাল, কিন্তু আমারও অনেকটা পথ যেতে হবে, পাঁচনটা করে দাও।

মধু পণ্ডিত বলে, আরে বোসো, হয়ে যাবে এক্ষুণি। ঐ চারজন

বরং তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাবে'খন। শচীনখুড়োকে নিতে এসেছিল, তা আমি বারণ করে দিয়েছি।

বগলাবাবু চমকে উঠে বললেন, শচীনখুড়োকে কোথায় নেবে! খুড়োর যে এখন তখন অবস্থা! এই তিনবার শ্বাস উঠল।

সেইজন্যই তো নিতে এসেছিল!

বগলাবাবু ভাল বুঝলেন না। পাঁচন তৈরি হল, লোকগুলোও খাওয়া ছেড়ে উঠল।

মধু পণ্ডিত হুকুম করল, এই, তোরা বগলাদাদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে যা।

বগলাবাবু কিন্তু-কিন্তু করেও ওদের সঙ্গে চললেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা বাবারা?

লোকগুলো পেন্নাম ঠুকে বলল, আজ্ঞে যমরাজার দূত, প্রায়ই আসি এদিক পানে। তবে সুবিধে করতে পারি না। ওদিকে যমমশাইকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়! কিন্তু মধু পণ্ডিত কাউকেই ছাড়ে না।

সেই কথা শুনে বগলাবাবু ভিরমি খেলেন বটে, কিন্তু মধু পণ্ডিতের খ্যাতি আরো বাড়ল।

হরেন গোঁসাইয়ের টিনের চালে একদিন জ্যোৎস্নারাতে ঢিল পড়ল। হরেন গোঁসাই হচ্ছেন গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোক, বয়স দেড়শ বছরের কিছু বেশী। ডাকাবুকো লোক। লাঠি হাতে বেরিয়ে এসে হাঁক দিলেন, কে রে?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে একটা তালগাছের মতো লম্বা সুড়ুঙ্গে চেহারার লোক এগিয়ে এসে বলল, আপনারা কী অশৈরী কাণ্ড শুরু করলেন বলুন তো! গাঁয়ের ভূত যে সব শেষ হয়ে গেল।

হরেন গোঁসাই হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে?

মানে আর কী বলব বলুন। ভূতরা হল আত্মা। চিরকাল ভূতগিরি তো তাদের পোষায় না। ডাক পড়লেই আবার মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিতে হয়। মানুষ মরে আবার টাটকা ছানা-ভূতেরা আসে। তা মশাই এক কোগ্রামে আমরা মোট হাজারখানেক ভূত ছিলাম। কিন্তু গত

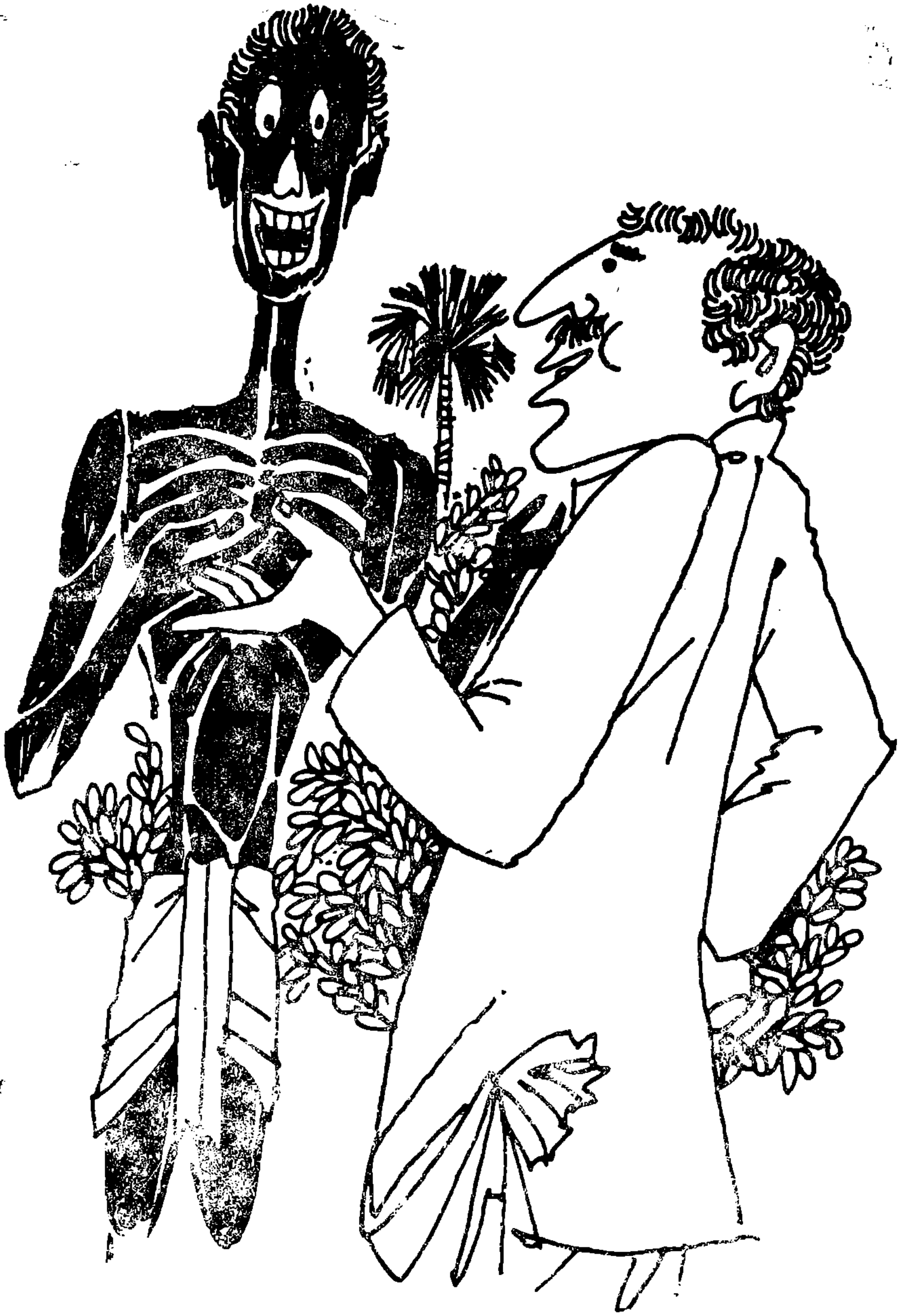

দেড়শ বছর ধরে একটাও নতুন ভূত আসেনি। ওদিকে একটি একটি করে ভূত গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। ইদানিং তো একেবারে জন্মের মড়ক লেগেছে আজ্ঞে। গত মাসখানেকে এক চোপাটে চুয়াল্লিশটা ভূত গায়েব হয়ে গেল। সর্দার রাগারাগি করবে।

তা আমি কী করব?

লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, আপনারা কি সব মরতে ভুলে গেছেন? আপনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম বড় আশা নিয়ে। কিন্তু আপনিও বেশ ধড়িবাজ লোক আছেন মাইরি। তা মধু পণ্ডিতের ওষুধ না খেলেই কি নয়?

ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে ভূতটা চলে গেল। কিন্তু ক'দিন পরই এক রাতে গাঁয়ের লোক সভয়ে ঘুম ভেঙে শুনল, রাস্তা দিয়ে এক অশরীরী মিছিল চলেছে। তাতে স্লোগান উঠছে, মধু পণ্ডিত নিপাত যাক্! নিপাত যাক্। নিপাত যাক্। এ তন্দরুস্তি ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ, ভুলো মৎ। এ এলাজি ঝুটা হ্যায়! ভুলো মৎ। ভুলো মৎ। মধুর নিদান মানছি না। মানছি না। মানব না।

কিন্তু মাস তিনেক পর একদিন সুড়ুঙ্গে ভূতটা খুব কাঁচুমাচু হয়ে মধু পণ্ডিতের বাড়িতে হাজির হল সন্ধে বেলায়।

মধু তামাক খাচ্ছিল, একটু হেসে বলল, কি হে. শুনলাম আমার বিরুদ্ধে খুব লেগেছো তোমরা।

পেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই, ঘাট হয়েছে।

কী হয়েছে বাপু?

আজ্ঞে এক আমি আর সর্দার ছিলাম গতকাল অবধি। আর সব জন্মের মড়কে গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু কাল রাতে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ, আমাদের বুড়ো সর্দার পর্যন্ত মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। আমি একেবারে একা।

একা তো ভালই, চরে বরে খা গে। এখন তো তোর একচ্ছত্র রাজত্ব।

জিভ কেটে ভূতটা বলল, কী যে বলেন! একা হয়ে এক প্রাণে

আর জল নেই। বড্ড ভয় ভয় করছে আজ্ঞে। খেতে পারচি না, শুতে পারচি না। রাতে শেয়াল ডাকে, প্যাঁচা ডাকে, আমি কেঁপে কেঁপে উঠি।

তা তোর ভয়টা কিসের ?

আজ্ঞে, একা হওয়ার পর থেকে আমার ভূতের ভয়ই হয়েছে, যমরাজার পেয়াদাগুলোও ভীষণ ট্যাটন। একা পেয়ে যাতায়াতের পথে আমাকে ডাঙস মেরে যায়।

ঠিক আছে, তুই বরং আমার সঙ্গেই থাক।

সেই থেকে সুড়ুঙ্গে ভূতটা মধু পণ্ডিতের বাড়িতে বহাল হল।

একদিন জমিদার কদম্বকেশরের ভাইপো কুন্দকেশর এসে হাজির। গম্ভীর গলায় বললেন, ওহে মধু, একটা কথা ছিল।

মধু তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে বলুন।

আমার বয়স কত জানো ?

বেশী বলে তো মনে হয় না।

কুন্দকিশোর একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, পঁচানব্বই, বুঝলে ? পঁচানব্বই। আমার কাকা কদম্বকেশরের বয়স জানো ?

খুব বেশী আর কী হবে ?

তোমার কাছে বেশী না লাগলেও, বেশীই। একশ পঁচিশ বছর।

তা হবে।

আমার কাকা নিঃসন্তান তা তো অন্তত জানো।

মধু পণ্ডিত মাথা চুলকে বলে, তা জানি, উনি গত হলে আপনারই সব সম্পত্তি পাওয়ার কথা।

জানো তাহলে ? বাঁচালে, তাহলে এও নিশ্চয়ই জানো কাকার সম্পত্তি পাবো এরকম একটা ভরসা পেয়েই আমি গত সত্তরটা বছর কাকার আশ্রয়ে আছি, জানো একদিন জমিদার হয়ে ছড়ি ঘোরাব বলে আমি ভালো করে লেখাপড়া করিনি পর্যন্ত ? একদিন জমিদারনী হবে এই আশায় আমার গিন্নী এখনো বুড়ো বয়সেও যে বাড়িতে ঝি-এর অধম

খাটে, তা জানো, আমার বড় ছেলের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে ! শোনো বাপু, কাকা মরুক এ আমি চাই না। কিন্তু হক্কের মরাই বা লোকে মরছে না কেন ? মরলে আমি কান্নাকাটিও করব, কিন্তু মরবে কোথায়। আর নাই যদি মরে বাপু, তবে অন্তত সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে তো যেতে পারে। বৈরাগী হয়ে পথে পথে দিব্যি বাউল গান তো গেয়ে বেড়াতে পারে। তা তোমার ওষুধে কি সে সবেও বারণ নাকি ? তোমার নামে লোকে যে কেন মামলা করে না সেইটেই বুঝি না।

মধু পণ্ডিত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার বয়স হয়েছে জানি, কিন্তু তাতে ভয় খাচ্ছেন কেন ? বয়স তো একটা সংস্কার মাত্র, শরীর যদি সুস্থ সবল থাকে মানসিকতা যদি স্বাভাবিক থাকে তবে আপনি একশো বছরেও যুবক। উল্টো হলে পঁচিশ বছরেও বুড়ো। এই আপনার কাকাকেই দেখুন না। মোটে তো সোয়া শ বছর বয়স, দেড়শ পেরিয়েও দিব্যি হাঁক ডাক করে বেঁচে থাকবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্দকেশর বললেন, বলছ ?

নির্যস সত্যি কথা।

কুন্দকেশর চলে গেলেন। কিছুদিন পর শোনা গেল, তিনি বিরানব্বই বছরের স্ত্রী আর পঁচাত্তর বছরের বড় ছেলের হাত ধরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

সন্ধে হয়ে এসেছে, প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে আজ। মেঘ ডাকছে। ঝড়ের হাওয়া বইছে। এই দুর্যোগে হঠাৎ মধু পণ্ডিতের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে মধু একটু অবাক, বেশ দশাসই চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে ঝলমলে জরির পোশাক। ইয়া গোঁপ, ইয়া বাবরি, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় একটা ঝলমলে টুপি, তাতে ময়ূরের পালক, গায়ের রং মিশমিশে কালো বটে, কিন্তু তবু লোকটি ভারী সুপুরুষ।

মধু পণ্ডিত হাতজোড় করে বললেন, আজ্ঞে আসুন, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

আমি তোমার যম। জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা বলল।

শুনে মধু পণ্ডিত একটু চমকে উঠল। খুন করবে নাকি? কোমরে একটা ভোজালিও দেখা যাচ্ছে। কাঁপা গলায় মধু বলল, আজ্ঞে।

লোকটা হেসে বলল, ভয় পেও না বাপু। আমি ভয় দেখাতে আসিনি। বরং বড় ভাইয়ের মত পরামর্শ দিতে এসেছি। তুমি এই গাঁ না ছাড়লে আমি কাজ করতে পারছি না। আমি যে সত্যিই যমরাজা তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই!

মধু দণ্ডবত হয়ে প্রণাম করে উঠে মাথা চুলকে বলে, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু শ্বশুরবাড়িটা কোথায় ছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না।

বলো কি? যমের চোখ কপালে উঠল, শ্বশুরবাড়ি লোকে ভোলে?

আজ্ঞে অনেক দিনের কথা তো, দাঁড়ান গিন্নিকে জিজ্ঞেস করে আসি, বলে মধু পণ্ডিত ভিতরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে একগাল হেসে বলে, এই বর্ধমানে গোবিন্দপুর। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। আমার শ্বশুর শাশুড়ি গত হয়েছেন।

যমরাজ বলেন, তা শালাশালীরা তো আছে।

ছিল, এখন আর নেই।

তাদের ছেলে-মেয়েরা সব।

আজ্ঞে তারাও গত হয়েছে। তস্য পুত্র-পৌত্রাদিরা আছে বটে। কিন্তু তারাও খুব বুড়ো। গিয়ে হাজির হলে চিনতে পারবে না।

যমরাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার বয়স কত মধু?

আজ্ঞে মনে নেই।

যমরাজা ডাকলেন, চিত্রগুপ্ত! মধুর হিসেবটা দেখ তো।

রোগা সুড়ুঙ্গে একটা লোক গলা বাড়িয়ে বলল, আজ্ঞে দুশো পঁচিশ।

ছিঃ ছিঃ মধু! যমরাজ অভিমান ভরে বললেন, এতদিন বাঁচতে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত ছিল। থাকগে, আমি তোমাকে কিছু বলব না। পৃথিবীর নিয়ম ভেঙ্গে চলছ চলো। মজা টের পাবে।

যমরাজ চলে গেলেন। মধু কিছুদিনের মধ্যেই মজা টের পেতে লাগলো।

হয়েছে কি, মধুর ওষুধ যে শুধু মানুষ খায় তা নয়। রোদে শুকুতে

দিলে পাখি-পক্ষীও খায়, ঘরে রাখলে পিঁপড়ে ধেড়ে ইঁদুরেও ভাগ বসায়। তাদেরও হঠাৎ আয়ু বাড়তে লাগল। কোগ্রামের মশা মাছি পর্যন্ত মরত না। বরং দিন দিন মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ইঁদুর ইত্যাদির দাপট বাড়তে লাগল। আরো মুস্কিল হল জীবাণুদের নিয়ে। কলেরা রুগীকে ওষুধ দিয়েছে মধু, তা সে ওষুধ কলেরার পোকাও খানিকটা খেয়ে নেয়। ফলে রুগীও মরে না, কিন্তু তার কলেরাও সারতে চায় না। সান্নিপাতিক রুগীরও সেই দশা, কোগ্রামে ঘরে ঘরে রুগী দেখা দিতে লাগল। তারা আর ওঠা হাঁটা চলা করতে পারে না। কিন্তু ওষুধের জোরে বেঁচে থাকে।

এক শীতের রাতে আবার যমরাজা এলেন।

মধু! কী ঠিক করলে?

আজ্ঞে লোকে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

তা তো একটু পাবেই। এখনো বলো যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও কিনা।

শশব্যস্ত দণ্ডবত হয়ে মধু পণ্ডিত বলে, আজ্ঞে না। তবে এখন যদি ওষুধ বন্ধ করি তবে চোখের পলকে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে। একশ বছর বয়সের নীচে কোনো লোক নেই।

যমরাজা গম্ভীর হয়ে বলেন, তা একটা ভাববার কথা বটে। তোমার এত প্রিয় গাঁ, তাকে শ্মশান করে দিতে কি আমারই ইচ্ছে? তবে একটা কথা বলি মধু। যেমন আছো থাকো সবাই। তবে গাঁয়ের বাইরে মাতব্বরি করতে কখনো যেও না। আমি গণ্ডি দিয়ে গেলাম। শুধু এই কোগ্রামের তোমরা যতদিন খুশি বেঁচে থাকো। অরুচি যতক্ষণ না হয়। তবে বাইরের কেউ এই গাঁয়ের সন্ধান পাবে না। কানাওলা ভূত চারদিকে পাহারা থাকবে। কোনো লোক এদিকে এসে পড়লে অন্য পথে তাদের ঘুরিয়ে দেবে।

মধু দণ্ডবত হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

সেই থেকে আজও শোনা যায়, কোগ্রামের কেউ মরে না। কিন্তু কোথায় সেই গ্রাম তা খুঁজে খুঁজে লোকে হয়রান। আজও কেউ খোঁজ পায়নি।

ফুলি চললো ফিলিমে

পূর্ণেন্দু পত্রী

দেবু তার মেজোবৌদি সুমিতার ঘরে ঢুকে সটান মেঝেয় শুয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে গড়াতে গড়াতে বললে—

—দারুণ গুড নিউজ আছে তোমার। সিনেমায় নামার চান্স এসে গেছে তো···

সুমিতা সদ্য স্নান সেরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে ঘাড়ে একটু পাউডারের পাফ বোলাচ্ছিল। সিনেমার কথায় ঠোঁটে লিপষ্টিক ঘষতে ঘষতেই ঠোঁট উল্টে বললে—থাক, সাত-সকালে তোমাকে আর সিনেমার কথা তুলে রসিকতা করতে হবে না। যখন বয়স ছিল, তখন কত জায়গা থেকে ডাক এল, রাজী হল না কেউ, না তোমার দিগ্‌গজ দাদা, না তোমার মা বাবা, আর এখন তিন ছেলের মা, এখন সিনেমার চান্সের খবর শোনাচ্ছ আমাকে···

—তোমার কথা বললুম কখন? কথা তো শেষই করিনি আমি।

—তবে?

—তোমার ফুলির।

—ফুলি। বেড়াল আবার সিনেমায় নামে নাকি?

—কেন নামবে না? সিনেমায় সকলেই নামে। হাতী মেরা সাথীতে হাতী নামেনি? বর্ন-ফ্রীতে সিংহ নামেনি? তামিল-তেলেগু ছবিতে দেখবে, ছাগল, গরু, কুকুরদের রোল নায়ক-নায়িকাদের চেয়ে বড়ো। সিনেমা তো কারো কেনা সম্পত্তি নয়! সকলেরই স্বাধীন

অধিকার আছে এখানে নামার। মশা, মাছি, টিকটিকি সকলেরই। এমন কি কাঁকড়া বিছেরাও। সোনার কেল্লা দেখনি ?

—কি জানি বাবা, আমি অত জানিনে। বেড়াল নামলো কি গরু নামলো অতো নজর দিয়ে দেখিনি কখনো। আমরা হিরো হিরোইন ভিলেন-টিলেন দেখি, তাদের কথাই মনে থাকে।

—মিথ্যে কথা বোলো না বৌদি! গত বছর একটা বাংলা ছবি, যার নায়ক ছিল একটা বাঁদর, দেখে এসে গদগদ হয়ে প্রশংসা করছিলে ?

—আহা! সেখানে তো বাঁদরটাই হিরো। হিরোরা যদি বাঁদর হয়, সে তো অন্য কথা।

—তোমার ফুলি যদি কোনো ছবির হিরোইন হয়, আপত্তি নেই তো?

—আমার আপত্তির কি আছে ? যে করবে তার সঙ্গে কথা বলবে তো আগে। এ্যাই ফুলিই-ই-ই, ও ফুলুমণি-ই···খাটের তলা থেকে আলস্য মাখানো গলায় ফুলি সাড়া দেয় খুব সংক্ষেপে।

—তোর ছোড়দা কি বলছে শোন।

ফুলি খাটের তলা থেকে মন্থর পায়ে বেরিয়ে এসে দেবুর সামনে গা-ঝাড়া দিয়ে গায়ের আড় ভাঙে। লম্বা একটা হাই তুলে চোখ থেকে ঘুম তাড়ায়! তারপর ল্যাজ দিয়ে মেঝের উপরে বসার জায়গাটা ঈষৎ ঝেঁটিয়ে নিয়ে আধশোয়ার মতো ভঙ্গীতে বসে।

—কি বলছিলে ?

—সিনেমায় নামবি ?

—না।

—কেন ?

—ফিলিম খুব খারাপ জায়গা। স্বভাব-চরিত্তির নষ্টো হয়ে যায়।

—তাই নাকি ? কি করে জানলি ?

—লোকে বলাবলি করে।

—লোকে তো বলে তুই খুব পেটুক। তা লোকের কথা শুনে তুই কি চুরি করে খাওয়া ছেড়েছিস ?

—আবার সেই খাওয়ার খোটা, দেখেছ মা!

ফুলি ঘুরে তাকায় সুমিতার দিকে। সুমিতা তখন ছোট ছেলের দুধ বানানোর জন্যে আমূলের টিন, জনতা স্টোভ, গেলাস, কেটলি ছাঁকনি চামচে ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত।

আমূলের টিন খোলা মাত্রই সোজা হয়ে বসল ফুলি। সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে ফুটে বেরোল বিচিত্র একটা শব্দ। এর অর্থ সুমিতা আর ফুলি ছাড়া কেউ জানে না। সুমিতা পাঁচ আঙ্গুলের চিমটেয় কৌটো থেকে খানিকটা আমূল গুঁড়ো তুলে নিয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে দেয়। ফুলি একটু একটু চাটে।

দেবু অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে।

—কি রে নামবি কিনা বল, নইলে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে···

—বাড়িতে তো আরো অনেক বেড়াল আছে, তাদের বল-না।

—ওরে বাঁদর, তাদের বলার থাকলে কি তোর কাছে আসতুম! যারা ছবিটা করছে আর যে ছবিটা করছে তাদের তোর মতই একটা বেড়াল দরকার। চিত্রনাট্যে লেখা আছে—বেড়ালটি হবে আর্কিটাইপ্যাল। অর্থাৎ বেড়াল জাতির প্রতিভূ। দেখিলেই দর্শক বুঝিয়া যাইবে, ইনিই সেই বিড়াল, যিনি বাঘের মাসি।

—কেন জোর করছো ছোড়দা, আমার মতো গায়ের রঙ আরো পাবে। সত্যি কথা বলছি, ফিলিম-টিলিম আমার তেমন পছন্দ নয়। দেখ-না টিভিতে যখন ফিলিম হয়, ঘরে থাকি না, বারান্দায় গিয়ে ঘুমোই। এটা তো মিক্সড্ ফ্রায়েড রাইস।

—তার মানে?

—তার মানে জান না? এত লেখাপড়া জানো আর ফিলিম যে মিক্সড্ ফ্রায়েড রাইস, সেটাই জানো না! এই তো কদিন আগে দিল্লীর যিনি কলকাতায় এসে, কলকাতায় যে চলচ্চিত্র উৎসব হবে তার কথা বলতে গিয়ে বললেন না যে, ফিলিম হলো এমন একটা আর্ট যেখানে আপনি সব পাবেন। যাত্রা, থিয়েটার, পপ-টপ, নাটক-খেউড়, গপ্পো-উপন্যাস, নাচ-গান, মার-পিট···

—খুব হয়েছে, তোকে আর বিদ্যে বমি করতে হবে না। এরপর কবে বলবি থিয়েটার হলো চিকেন চাউমেন, যাত্রা হলো বড়া কাবাব। তাহলে তোর গরজ নেই ?

—রাজী হতে পারি, তবে এক সর্ত্তে।

—কি বল্।

—ফিলিমে বেড়ালদের যে-রকম দেখানো হয়, সে-রকম দেখালে চলবে না।

—বেড়াল সিনেমায় নামলে, তাকে বেড়ালের মতোই দেখতে না হয়ে কি হরিণের মতো না ক্যাঙারুর মতো হবে ?

—তা বলছি না। স্বভাব-চরিত্তিরের কথা বলছি। ফিলিমে খুব হ্যানস্তা করা হয় তো আমাদের। যেন বেড়াল জাতটা শুধু চুরি করে খাওয়া ছাড়া আর কিছু জানে না। অথচ আমরা যে গেরস্থের কতো কাজে লাগি···

—কে হেনস্তা করছে তোদের ? কবে ?

—অনেকবার। ডিটেকটিভ ছবি হলেই বেড়ালের রঙ হয়ে যাবে কালো। সে যেন যমের চেলা। তোমরা 'পথের পাঁচালী' 'পথের পাঁচালী' করে অতো নাচাও, অথচ সেখানেও আমাদের উপর কী না তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ! সত্যজিৎ বাবুর মতো অতো বড়ো একজন গণ্যিমান্যি পরিচালক কী করে যে আমাদেরই এক নাবালক জাতভায়ের ঘাড়ের উপর ইন্দির ঠাকরুণের ঐ নোংরা পুঁটুলীটা ছুঁড়ে ফেললেন, সত্যি, ভাবতে লজ্জা হয়। নিতান্তই আমাদের কোনো ইউনিয়ন-টিউনিয়ন নেই। থাকলে তুলকালাম হয়ে যেতো। অথচ দেখো ফরাসী পরিচালকরা কতো ভালো। ত্রুফো লোকটা তার ঐ 'ডে ফর নাইটে' কী চমৎকার করে বেড়ালটাকে দিয়ে খাওয়ালো। ফরাসীরা ছাড়া ফিলিমে আর বেড়ালদের মর্ম বোঝে না কেউ ! আহা ! বোদলেয়ারের কী মধুমাখা কবিতা বেড়াল-সুন্দরীকে নিয়ে।

—ওঃ, তোর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেল। তাহলে রাজী আছিস তো ?

—ধরে নাও, আছি। কত দেবে? লো বাজেট নিউ ওয়েভ নয় তো? দেবু উত্তর দিতে যাবে, এই সময় সেজকত্তা এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। বিষণ্ণ, উদ্‌ভ্রান্ত এবং ক্রুদ্ধ।

—বৌমা, তোমার ঐ ফুলিটা কোথায় বল তো! ওকে গুলি করবো। দেবু ঘুরে তাকিয়ে দেখে, সেজকত্তার চটি জুতোর চটর-পটর শুনেই কোন্ ফাঁকে জানলা গলে চম্পট দিয়েছে ফুলি। সুমিতার বদলে দেবুই প্রশ্ন করে—কেন, কী হয়েছে সেজকাকা?

—সর্বনাশ করেছে আমার। ছানা কাটাবার গুঁড়ো কেনার খরচটা বাঁচানোর জন্যে আমি একটা এক্সপেরিমেণ্ট করছিলুম এক জার্মান সাহেবের লেখায় ইনস্‌পায়ার্ড হয়ে। বৌদির কাছ থেকে এক জাম-বাটি দুধ এনে আমার ঘরের মেঝেয় রেখে তার ভিতরে মন্ত্রলেখা একটা কাগজ, আর তানপুরার বাজতে-বাজতে ছিঁড়ে যাওয়া জোয়ারির তার ডুবিয়ে বাথরুমে গেছি স্নান করতে। ফিরে এসে দেখি জামবাটি ফাঁকা। সেই সঙ্গে মন্ত্রপূত কাগজ আর তানপুরার তার। আমার এক বছরের সাধনা···গবেষণা, সব এখন ওর পেটে।

পেশা-বদল

লীলা মজুমদার

বড় কাকা কোন নামকরা খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও, তাঁর অবস্থাটা খুব একটা আরামপ্রদ নয়। ছোট সম্পাদক মশাই তাঁকে যখন-তখন যেখানে-সেখানে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দেন। বিপদ-আপদ, যাতায়াতের অসুবিধা, মোহনবাগানের ম্যাচ, কিছুই কানে তোলেন না। খবর সরবরাহ করবার পরেও রেহাই নেই, জনসাধারণের বেশির ভাগই হয় রেগে টং, নয় এক গাল হেসে বলে মিথ্যা কথা বলবার আর জায়গা পায়নি! শুধু মুখে বলে না, বড় সম্পাদককে লিখে পাঠায়। তিনি ছোট সম্পাদককে ডেকে পাঠান। তিনি আবার বড় কাকাকে যা নয় তাই বলেন। বলেন, "ওহে আমরাই কি আর সব সময় অকুস্থলে যেতাম, নাকি যাওয়া সম্ভব ছিল? তবে বিবৃতিটা একটু কলম টেনে লিখতে হয় তো? আসলে পাঠকরা অত সত্যি-মিথ্যার ধার ধারে না, বিবৃতিটা বিশ্বাসযোগ্য হলেই হল।"

এবার বড় কাকা হেঁড়ে গলায় বললেন, "কোথায় যেতে হবে, সেটা আগে বলুন। আপনার মটর-সাইকেলটা পাব তো?" ছোট সম্পাদক শুনে আকাশ থেকে পড়লেন, "জয়-ঢাক পিটিয়ে সেখানে গেলেই হয়েছে! গিয়ে দেখবে সব ভোঁ-ভাঁ, যে দু-একজন থাকবে, তারা মুখে কুলুপ এঁটে থাকবে। জনসাধারণের একজন হয়ে যাবে, প্রথমে ট্রেনে, তারপর পায়ে হেঁটে। সেই পুরনো নীল পেণ্টেলুন আর পটলার ছেঁড়া চেক্ শার্ট পরবে, চপ্পল পায়ে দেবে। বলবে, সরকারি মাছের চাষের তথ্য সংগ্রহ করতে গেছ। পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা নদী পুকুর ডোবার নাম, মাপ, অবস্থান লিখে. ম্যাপে এঁকে আনতে—"

বড় কাকা লাফিয়ে উঠে বললেন, "ম্যাপ? ও আমি পারবো না।

আমি সায়েন্সের ছেলে। আর কাউকে পাঠান।”

ছোট সম্পাদক বললেন, “শুনলাম নাকি আমাদের আপিসের বাড়তি দশজন ছাঁটাই হবে—।” বড় কাকা বললেন, “ঠিকানা বলুন।”

ছোট সম্পাদক তো হাঁ! “ঠিকানা বলব মানে? জানলে তো বলব। তাছাড়া একটা গোটা গাঁয়ের আবার কি রাস্তার নম্বর হয় নাকি? নামটাও ভালো মনে করতে পারছি না, অম্বুজা, কিম্বা শম্বুকী, কি ঐ ধরনের কিছু একটি স্ব আছে, কিম্বা ণ্ড-ও হতে পারে। মোট কথা বেজায় অদ্ভুত গ্রাম, ও-রকম আর একটাও গ্রাম ভূ-ভারতে নেই। ভুল হবার কোনো উপায় থাকলে তো ভুল জায়গায় যাবে। সে সব নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।”

এই বলে চায়ের দোকানের ছোকরা ছোট রমেশকে চারটে মাছের চপ আর দু পেয়ালা চা ফরমায়েস দিতেই, বড় কাকার রাগ অনেকটা পড়ে গেল।

ছোট সম্পাদক বললেন, “বুঝলে, বাঁকড়ো বীরভূম সাইডেই হবে জায়গাটা। মনে হয় লুপ লাইনের গাড়ি ধরে আমেদপুর কি ঐ রকম কোথাও নেমে পড়লে, ঠিক পেয়ে যাবে।” ছোট রমেশকে বললেন, “চারটে আলুর পরটাও আন্।”

বড় কাকা বললেন, “গ্রামটার নাম মনে নেই, কোথায় জানেন না, সেখানে কি ব্যাপার সেটুকু বলবেন তো?”

ছোট সম্পাদক হ্যা-হ্যা করে হেসে বললেন, সেইখানেই তো সমস্যা, কি ব্যাপার সেটা জানবার জন্যই তো অদ্দূর যাওয়া।” বড় কাকা অবাক। ছোট সম্পাদক বললেন, “খাও, তারপর ছাঁচি পান খাওয়াব। গ্রামটা বেজায় অদ্ভুত। সকলের অবস্থা ভালো। ভাবতে পার গাঁয়ে একটা গরীব লোক নেই? খেত-খামার, গরু-ছাগল, বড় ব্যবসা, কিচ্ছু নেই। অথচ সবাই পরম সুখে আছে।”

বড় কাকা বললেন, “হয়তো ভালো চাকরি বাকরি—”

“আরে না, না। তাহলে আর খরচাপাতি করে লোক পাঠানো কেন? কেউ কোন কাজ করে না। সকলে ভাল ভাল প্যাণ্ট শার্ট পরে,

লুচিটুচি খেয়ে, বড়জোর পুকুরে গিয়ে মাছ ধরে। ব্যস্, তার বেশি নয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খুব প্রাচীন সব পুকুর আছে নাকি। কে, রমেশ! এখানে রাখ আর মুকুন্দর কাছ থেকে চারটে ছাঁচি পান নিয়ে আয় তো বাপ।"

এতক্ষণে বড় কাকা অন্ধকারে পথ দেখলেন, "তাহলে আমিও যদি বড়-কর্তার পুরনো ছিপটা আর কিছু ভালো চারের মশলা নিয়ে যাই, তবেই তো ভালো হয়। কেউ সন্দেহও করবে না। ঐ সূত্রে দিব্যি ভাব জমিয়ে ভেতরের কথা জেনে নিতে পারা যাবে। আচ্ছা, ওদের মিসায় ধরে না কেন?—অবিশ্যি আমার কোনো আপত্তি নেই, মাছটাছ পাব।"

ছোটবাবু চটে গেলেন, "ধরবেটা কাকে? বলছি ওদের বিষয়ে কেউ কিছু জানে না, আমাদের সেই জানানটা দিতে হবে, তারপর না হয় মিসা-ফিসা।"

বড় কাকা আরেকটু গাঁইগুঁই করলেন, "দেখুন, যারা ভালো মাছ ধরে তাদের ধরিয়ে দিতে আমার মন সরে না। আর কাউকে পাঠান।"

ছোটবাবু রেগে বললেন, "আর কাউকে কেন পাঠাব? একমাত্র তোমাকে পাঠালেই কাজের কোন ক্ষতি হবে না। আজ রাতেই রওনা হবে। আমেদপুর অবধি টিকিট কেটে রাখছি। সেখানে নেমে জায়গা খুঁজে নেওয়া, ব্যস্ কি এমন শক্ত কাজ!"

তাই হল শেষ পর্যন্ত। তবে রাতের গাড়িতে নয়, পরদিন সকালের গাড়িতে। খানা জংশনের পর যেই না গাড়ি লুপ লাইনে ঢুকল, চার দিকটা কেমন অন্য রকম হয়ে গেল। মাটির রঙ বদলে গেল, গাছপালা অন্য রকম হল, এমন কি কাক শালিখের সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ডোরা-কাটা হুপো পাখি দেখা যেতে লাগল। সহযাত্রীদের চেহারাও অন্য রকম মনে হল, ঢ্যাঙা, কালো কোঁকড়া চুল, কাটা কাটা নাক মুখ। বড় কাকার মন ভালো হয়ে গেল।

তার ওপর সঙ্গীও জুটে গেল। চোখ বুজে ঢুলছেন, এমন সময় নাকে এল একটা চেনা চেনা সোঁদা গন্ধ। চোখ খুলে দেখেন লম্বা

কালো একটা লোক, সঙ্গে এক গোছা ছিপ আর একটা মুখবন্ধ পিতলের হাঁড়ি, তাতে যে মাছ ধরার চার ছাড়া আর কিছু নয়, সে আর বলে দিতে হবে না। লোকটা সন্দেহের সঙ্গে বড় কাকার কাগজে ছড়ানো ছিপ আর মাছের চারের গন্ধওয়ালা হ্যাভারস্যাকের দিকে তাকিয়ে বলল, "ডানকুনিতেও তো বড় বড় মেছো পুকুর আছে, তাহলে এ মুলুকে কেন ?" শুনে পিত্তি জ্বলে গেলেও বড় কাকা হেসে বললেন, "ডানকুনি দিয়ে হবে না, মশাই। সরকারের চাকরি করি, বলে নাকি বাঁকড়ো বীরভূমের যত সব খালবিল নদী পুকুর, সব জায়গার নক্সা চাই, মাছের চাষ হবে। এই আর কি।"

লোকটা বলল, "ছিপ দিয়ে নক্সা হবে নাকি ?"

"না, তা হবে না, তবে কোথায় মাছ আছে না আছে দেখতে হবে তো ?"

লোকটা ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "চোত-বোশেখের পর শুকিয়ে খটখট করে—মাছের চাষ কেমন করে হবে শুনি ?" বড় কাকা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তাহলে আপনার সঙ্গেই বা ছিপ মশলা কেন ?"

অন্য দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে লোকটা বলল, "তাই বলে সব কি আর শুকোয় ? একেক জায়গায় ভূমি পাতলা হয়, পৃথিবীর ভেতরকার জল বুড়বুড়ি দিয়ে বেরুতে থাকে, কোথাও ফুটন্ত, তাতে গন্ধকের গন্ধ, কোথাও ঠাণ্ডা টলটলে মিষ্টি।"

বড় কাকা বললেন, "ধেৎ! তাই আবার হয় নাকি ?" লোকটা চটে গেল, "হয় কি না হয়, আমার সঙ্গে কন্থু গাঁয়ে গিয়ে দেখলেই পারবেন। তবে ঐ মাপজোখ চলবে না। ওখানকার লোকদের চেনেন না তো, বেশি টঁ্যা-ফোঁ করতে গেলে পুঁতে ফেলবে। কন্থুগ্রাম শুনে বড় কাকার দু'কান খাড়া। জিভ কেটে বললেন, "পাগল! একবারটি দেখেই চলে আসব।"

লোকটি বলল, "তাহলে উঠুন, এই আমেদপুরেই নামতে হবে। তারপর হাঁটতে পারবেন তো ?"

তা আর পারবেন না বড় কাকা, ছোট সম্পাদকের জ্বালায়! কোথায় হাঁটতে বাকি রেখেছেন ? চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান তাঁর নখাগ্রে।

তবে এ দিকটার সঙ্গে বিশেষ চেনা নেই। বেশ জায়গা কিন্তু। শুকনো খরখরে, উঁচুনিচু ডাঙা জমি, শাল, শিমূল, খেজুর, কেমন একটু পাহাড়ে পাহাড়ে ভাব।

গ্রামটা সরু রাস্তাটার একেবারে ওপরে। চারদিকে মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। লোকটা বলল, "কি দেখছেন? এক মানুষ পুরু, তিন মানুষ খাড়া, সেকালের ঠ্যাঙাড়ে ঠেকাবার ব্যবস্থা। এখনো কাজে লাগে। আসুন আমার সঙ্গে, এই রকম আরেকটা গাঁ পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না।"

গ্রামে ঢুকে বড় কাকা আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না, পরিষ্কার পথের দুধারে গাছ দিয়ে ছায়া করা সব পাকা বাড়ি, একটা চায়ের দোকান মনে হল, লোকটা বলল নাকি ওদের ক্লাব। তার বাঁধানো চওড়া রকে বসে কয়েকজন চা খাচ্ছে, ট্র্যান্‌জিস্‌টর বাজছে, সকলের নাইলনের শার্ট গায়ে, হাতে সিগারেট, পায়ে চপ্পল। এই রকম জায়গাতে স্থানীয় খবর পাওয়া যায়।

ওদের দেখে তারা মহা খুশি, "ওয়া! ওয়া! এই তো তাসের ছি পার্টি হয়ে গেল!" বসলেন গিয়ে বড় কাকা। চীনেমাটির পেয়ালায় নতুন চা এল. বড় ডিশে গরম মুড়ি আর পিঁয়াজি এল। বড় কাকা একমুঠো মুখে পুরে হাতের তাস গুণে নিয়ে বললেন, "আজ কি আপনাদের ছুটি? ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, "ছুটি আবার কিসের? এ-গ্রামে কেউ চাকরি-টাকরি করে না। ছুটি বললেই ছুটি, আবার কাজ বললেই কাজ।" আরেকজন বলল, "তাছাড়া আমাদের সকলের নাইট-ডিউটি দিনের বেলা কেউ কাজ করি না। নিজেদের ব্যবসা কি না।" বড় কাকা তাস বাছতে বাছতে বললেন, "তা খুব লাভজনক পেশা বলুন। হরিণের চামড়ার চপ্পল। সিগারেট লাইটার। অমন পেশা পেলে আমিও চাকরি ছাড়ি।" একটা তাস ফেলে বললেন, "আমাকে কত মাইনে দেয় বললে আপনারা ছোঃ ছোঃ বলে আমার গায়ে থুতু দিয়ে, এখান থেকে আমাকে উঠিয়ে দেবেন। দুশো দশ টাকা বুঝলেন তার সবটিই প্রায় গিন্নী গাপ করেন।"

ওরা মহা খুশি। একজন বললেন, "থেকে যান, থেকে যান, গিন্নী আপনার টিকির ডগার নাগাল পাবে না। ও কি জামা কাপড় গায়ে দিয়েছেন, ছি ছি, আবার ক্যাম্বিশের জুতো পরেছেন !! লম্বু তুমি বলছিলে না ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শেখাবার একজন লোক দরকার ?"

ওদের মধ্যে সব চাইতে যে বুড়ো, সেই হল মোড়ল। তার পরনে তসরের ধুতি। সে বলল, "যেখানে কারো চোদ্দপুরুষে কেউ কখনো চাকরি-বাকরি করেনি, সেখানে ও এসে পণ্ডিতমশায়ের চাকরি নেবে কেন, ব্যোমকেশের কি হল ?"

বাকিরা এ ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, "তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, মোড়ল।" মোড়ল আঁৎকে উঠল, "পাওয়া যাচ্ছে না ? বলিস কি রে ! আর তোরা দিব্যি সুন্দর তাস পেটাচ্ছিস্ !" সব চেয়ে যে বেঁটে সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বড় কাকার সব তাস দেখে নিয়ে বলল, "আমরা আবার কি করব ? তাকে নিশ্চয় ধরেছে।" তাই শুনে মোড়ল হাত-পা এলিয়ে রক্ থেকে নীচে পড়ে গেল। লম্বু বলে এক-জন মোড়লের মুখে ঠাণ্ডা চা ছিটিয়ে বলল, "আহা, ঠাট্টাও বোঝ না, খুড়ো। সে কলকেতা গেছিল ভালো ছিপ আর চার আনতে। তাকে কেউ ধরেনি, সে-ই বরং এনাকে ধরে এনেছে, পণ্ডিতমশাই করবার জন্য। তার আর ভালো লাগছে না।"

মোড়ল খচমচ করে রকে উঠে বলল, "ভালো লাগছে না বললেই হল ! রাত-পাচারো করবে না, পণ্ডিতমশাইও হবে না। তাহলে চলবে কি করে ?"

বাকিরা তাস বন্ধ করে বলল, "দেখ মোড়ল, আমাদের জিনিসপত্র সওদা করবার লোক দরকার, ব্যোমকেশ তাই করবে। তুমি কি শার্টের রং চিনতে পার ? নাকি গণেশ ময়রা পারে ? এই লোকটি মাছ ধরতে ভালবাসে, এ হবে পণ্ডিত মশাই।" মোড়ল বলল, "বাইরের লোককে তো কখনো এখানে থাকতে দেওয়া হয়নি। যদি পালিয়ে গিয়ে সব কথা বলে দেয় ?" কাকার দু কান খাড়া। ছোটবাবু গোপন করলে কি হবে, যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক তাই !

লম্বু বলল, "পালাবে কি রে ? ফটক তো বন্ধ।" চমকে বড় কাকা চেয়ে দেখেন বাস্তবিক-ই মোটা মোটা শালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী ফটকটি বন্ধ। অবিশ্যি তার জন্য ভাবনা নেই, ভাবনা হল এদের সব অদ্ভুত কথাবার্তা লিখে রাখা যাচ্ছে না, ভুলে যাবার ভয় আছে। এমনিতেই ছোট সম্পাদক কখনই বিশ্বাস করবেন না। তার ওপর কিছু কিছু বাদ পড়লেই তো হয়ে গেল। তাছাড়া নিজেরও খুব বেশি মালুম দিচ্ছিল না। তবে এটা যে একটা চোরা-চালানিদের ঘাঁটি তাতে সন্দেহ নেই। সমুদ্রতীর থেকে এত দূরে যে স্মাগলড্ গুডস্ কেউ মজুত রাখতে পারে, অনুসন্ধানকারীরা সন্দেহ-ও করবে না।

এক নিমেষে বড় কাকার চোখে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কাজকর্ম না করেও এদের এত সাচ্ছল্যের—আর শুধু সাচ্ছল্যই বা কেন, দস্তুর-মতো বড়মানুষির রহস্য তাঁর কাছে প্রকট হয়ে গেল। এখন সামগ্রী-গুলো লুকোবার জায়গাটা বের করা আর কাগজে কলমে লিখে রাখাটুকু বাকি। হঠাৎ মুখটা হাঁড়ি হয়ে গেল। বিবৃতিটা যদি ওঁর নামে বের করতে না দেয়? তাছাড়া এসব কথা ছেপে বের করে দিলেই তো পুলিশ-পেয়াদা থানা-দারোগা শুরু হয়ে যাবে। এ লোকগুলো তো খুব খারাপ নয়। ক'দিন যদি ওঁকে আটকেই রাখে, তাতেই বা ক্ষতি কি ? গত বছর পুজোর সময় পর্যন্ত ছোটবাবু ছুটি দেয়নি। কোথায় নাকি দুগগোঠাকুরের মুণ্ডু নড়ছিল, তার বিবৃতি আনতে পাঠিয়েছিল। দূর, দূর, খবরের কাগজে কখনো কেউ কাজ করে ! গিয়ে দেখেন, কিচ্ছু না, পাড়ার ছোকরারাও যেমন, ঠাকুর বসাতে গিয়ে গলার জোড়া ভেঙে ফেলেছিল। তারপর রবার সলিউশন আর টন্ সুতো দিয়ে সেটা মেরামত করা হয়েছিল, তা একটু-আধটু নড়বে না তো কি হবে ? ফিরে এসে কিছু ফাঁস করেননি, বলেছিলেন সব বাজে কথা। ও বেচারাদের বিপদে ফেলে কি লাভ ? তাছাড়া হেঁড়ে মতো চেহারার মস্তানটি বলেছিল, "এ বিষয়ে একটি কথা লিখেছেন তো পিটিয়ে ছাতু করব। ঠাকুরের মুণ্ডু নড়ছে বলে আপনার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে, মশাই ?" উপস্থিত বুদ্ধির জন্য বড় কাকা বিখ্যাত। তিনি বললেন, "রোজ মাছ ধরতে দাও যদি,

তাহলে পণ্ডিত হতে আমার আপত্তি নেই, ত্যাঁদড় ছেলেপুলে আমি ভয় পাই না।" মোড়ল বলল, "মেয়েগুলো বেশি ত্যাঁদড়। তা হোক গে। কাল থেকে পড়াব, আজ একবার পুকুরে নিয়ে চল।"

বাস্তবিক আশ্চর্য পুকুর। এই রকম শুকনো খরার দেশ, সেখানে টলটল করছে গভীর কালো জল। তার কিছু দূরেই গরম জলের পুকুর। সেটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার জল বেরিয়ে যাবার জন্য নাকি এক মানুষ পুরু মাটির দেওয়ালের অনেক নিচে মাটির তলায় নালা কাটা আছে। সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিতে বড় কাকার বেশি দেরি লাগেনি। মায় কোথা দিয়ে মাল পাচার হয় সবসুদ্ধ।

মোড়লের বাড়িতে তুলল বড় কাকাকে। যত্নও হবে, নজরেও থাকবেন। বড় কাকার আর কি আপত্তি থাকতে পারে। বড় পুকুরের মোটা মাছের গাদার ঝাল আর পেটির অম্বল আর পোস্তো দেওয়া ছোট ছোট বড়ি ভাজা আর গাওয়া ঘি দিয়ে গোবিন্দভোগ চালের ভাতকে কি আর খুব খারাপ বলা চলে। তারপর নেয়ারের খাটে বালাপোষ গায়ে পেড়ে ঘুম। বিকেলে ঘুম থেকে টেনে তুলে লম্বু ওঁকে মাছ ধরতে নিয়ে গেল। খুব ভালো মশলা দিয়ে পান খাওয়াল। মশলা দেখে মাছ ধরবার চারের কথা মনে পড়ল। তার কৌটো বের করতেই লম্বু হেসে কুটোপাটি। "আরে ওসব লাগবে না, মাছ কিলবিল করে, জলের মধ্যে জায়গা কুলোয় না। সত্যি কথা বলতে কি, ছিপটাও নেবার দরকার নেই। হাত ডুবিয়ে মাছ ধরা যায়।"

অবাক হয়ে বড় কাকা বললেন, "কেন, ছিপ দিয়ে তোমরা মাছ ধর না? তবে যে ট্রেনের সেই লোকটা ছিপের বাণ্ডিল নিয়ে এল?"

ছিপের বাণ্ডিল কে বলল? আঁকশী বলুন। তার অন্য কাজ আছে। তাছাড়া মাছ ধরব কখন? সারারাত ডিউটি দিই, সারাদিন চান খাওয়া ঘুমেই কেটে যায়। আজ রাতে নেহাৎ ছুটি তাই আমাদের দেখতে পাচ্ছেন। চারদিকে পেয়াদা চারিয়ে আছে দেখলেন না? বড় কাকা তো অবাক, কই, না তো, পেয়াদা তো কিচ্ছু দেখলাম না। এক যদি তোমাদের ব্যোমকেশ পেয়াদা হয়—" এই অবধি শুনে লম্বু চটে

কাঁই। উঠে দাঁড়িয়ে জলে কনুই অবধি হাত ডুবিয়ে দুটো দেড়সেরি মাছ ধরে দিয়ে লম্বু বলল, "নিন উঠুন, আর এখানে থাকলে রেগেমেগে সব কথা বলে ফেলব। ব্যোমকেশদা বলেছে আপনারা যা দেখেন তাই নাকি কাগজে লিখে দেন, অবশ্যি ছোটবাবুর নামে—কি হল?"

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বড় কাকা বললেন, "ছিপে মাছ গেঁথেছে। খুব ভারি মাছ, হাঙর-টাঙর না হলে বাঁচা যায়—হেঁইও! আহা—হা—হা আমার হাত ধর কেন? বলতে বলতে ছিপের সঙ্গে বঁড়শীতে গাঁথা পেতলের মাঝারি সাইজের একটা মুখবন্ধ ঘড়া উঠে এল। তার দুপাশে দুটি কড়া, একটিতে বঁড়শী লেগেছে, তাই দেখে লম্বুর চুল খাড়া। "এই সেরেছে—ও মোড়লদা—আ!" এই বলে এক দৌড়।

বিশ্বাসযোগ্য বিবৃতি দিতে হবে, কাজেই এই সুযোগে পিতলের ঘড়ার প্যাঁচ লাগানো মুখটা খুলেই বড় কাকা থ'। হাত থেকে ঘড়া পড়ে গেল, ভিতর থেকে একটি এই বড় মোহর পড়ে গড়িয়ে গিয়ে জলের ধারে আটকাল। সঙ্গে সঙ্গে উঠি পড়ি করে মোড়ল ছুটে এসে বড় কাকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "খুজে দিলি বাপ? বুড়ো ঠাকুরদার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া আশীর্বাদী ঘড়াটি দেড়শো বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছিল না। বাঁচালি বাপ! বড় কষ্টে দিন যাচ্ছিল।"

এই বলে ঘড়ার মুখ এঁটে, সেটাকে আবার পুকুরে ফেলে দিল। ঠং করে শব্দ হল। তারপর এক এলাহি কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। মোড়লের বুড়ো ঠাকুরদার পুরানো ঘড়া পাওয়া গেছে, গাঁ-সুদ্ধ সবাই আহ্লাদে আটখানা। বড় কাকা একটু ভাবিত, এ সব গল্পের বইয়ের মতো ব্যাপার লিখলে লোকে বিশ্বাস করবে তো? ছোটবাবু বলে দিয়েছিলেন সত্যি-মিথ্যায় ততটা এসে যায় না, লোককে বিশ্বাস করাতে হবে।

বড় কাকাকে নতুন ধুতি দিয়ে, লাল ফুলের মালা দিয়ে, ছোট ছোট মেয়েরা প্রণাম করল। রাতে সুগন্ধ চালের ঘি-ভাত, কচ্ছপের মাংস আর লাল ঘন ক্ষীর খাওয়া হল। শুয়ে আর বড় কাকার ঘুম আসে না। এ-পাশ ও-পাশ করছেন, ঘর অন্ধকার, এমন সময় মোড়ল এসে পাশে বসল। তার মাথার কড়া গন্ধ-তেলের গন্ধ থেকেই তাকে চেনা গেল।

মোড়ল ফিসফিস করে বলল, "ব্যোমকেশ বলেছে তুমি আমার পদ্যগুলো কাগজে ছাপিয়ে দিতে পার। তাই যদি দাও তো তোমাকে এখান থেকে পালাবার উপায় করে দিই।"

বড় কাকা সটাং উঠে বসে বললেন, "ছাপিয়ে দেব, আগে বল তোমরা দিনে কাজ কর না, রাতে কিসের ডিউটি দাও?" মোড়ল একটু উসখুস করে বলল, "ছাপাবে তো ঠিক? তাহলে বলি আমরা কোথাও চাকরি করি না, চাকরি আমরা ঘেন্না করি। আমরা চাষবাস করি না, সে-সবও আমরা ঘেন্না করি। পাঁচশো বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা রাত জেগে জিনিস পাচার করার ব্যবসা করে এসেছেন।"

তবে কি যা সন্দেহ করেছিলেন তাই? চোরা কারবার! বড় কাকা বললেন, "খুলে বল। কি জিনিস পাচার কর?" হাই তুলে মোড়ল বলল, "কি আবার পাচার করব? কারো সোনাদানা কারো টাকাকড়ি।"

"অমনি দিয়ে দেয় তারা?" ফিক্ করে মোড়ল হেসে বলল, "তাই দেয় কখনো? একটু ঠ্যাঙাই-ট্যাঙাই, তবে প্রাণে মারি না, তাতে পাপ হয়।—পদ্যগুলো ছাপিয়ে দিও, বাপ, নইলে এইখানে পণ্ডিতি করে জীবন কাটাতে হবে। ফটক খোলা হবে না। সবচেয়ে ষণ্ডা যারা তারা অষ্টপ্রহর পাহারা দেয়।"

বড় কাকা হাত বাড়িয়ে বললেন, "কই, দাও তোমার পদ্য, দেখি কি করতে পারি।—কিন্তু ফটক বন্ধ, পালাব কি করে?" মোড়ল আবার ফিক্ করে হেসে বলল, "বাঁশবাজি জান না? আমার বুড়ো ঠাকুরদা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে বাঁশ ধরে তিনতলা সমান লাফ দিয়েছিল শোননি? সে যাকগে, আরো ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাক, মেয়েরা ঘুমোলে তোমাকে নিয়ে যাব, ওরা বড় চুকলিখোর একবার টের পেলে আর তোমার যাওয়া হবে না। এই নাও পদ্য।"

বড় কাকা হ্যাভারস্যাকে পদ্যের তাড়া গুঁজে সবে চোখ বুজেছেন, এমন সময় লম্বু এসে হাজির। এসেই ফিসফিস করে বলল, "কি বলছিল বুড়ো? আমি আপনাকে পালাবার উপায় বাতলে দেব। পণ্ডিতি করতে হয় আমি করব। আর রাত জাগতে পারিনে। ভাবতে পারেন চোদ্দ

পুরুষ ধরে আমাদের গাঁয়ের কোনো পুরুষ মানুষ রাতে ঘুমোয়নি ? এক পুজোর দিন ছাড়া, যেমন আজকে ।”

বড় কাকা উঠে বললেন, “পণ্ডিতি করবে কি করে ? সংস্কৃত জান ? ব্যোমকেশ কেন করবে না ?” লম্বু একটু হম্-হাম্ করে বলল, “করবে না কারণ আমি বলেছি রিজাইন না করলে গলাফ পাকিয়ে গিঁট বেঁধে দেব ।”

“বড় কাকা বললেন, সব্বাই রাতে ঘুমোতে চায় নাকি ?”

“তা চাইবে না ? চোদ্দ পুরুষের জমানো ঘুম ।”

বড় কাকা বললেন, “তার চেয়ে এ-সব ছেড়ে দিয়ে সব্বাই পুলিসে চাকরি নিয়ে ফেল না কেন ? সারারাত এবং দিনেও অনেকক্ষণ ঘুমোতে পাবে । মাইনে পাবে, পোষাক পাবে, ছুটি পাবে । পেয়াদার ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না, বরং তোমাদের ভয়ে লোক পালাবে, চুরি-চামারি বন্ধ হবে, মাইনে বাড়বে. নাম হবে, সম্পাদকরা সেধে তোমাদের মোড়লের পদ্য ছাপাবে ।”

তাই শুনে লম্বু আহ্লাদে আটখানা হয়ে বড় কাকার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মাথা ঠুকতে লাগল ।

“তাই যেন হয়, কর্তা, পণ্ডিতি করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই, নিজের নাম-ই ভালো করে লিখতে পারি না । চলুন, মত বদলাবার আগে আপনাকে রেল-স্টেশন অবধি পৌঁছে দিই । শেষ রাতের গাড়ি ধরবেন ।” এই বলে লম্বু হ্যাভারস্যাক তুলে নিল ।

চারদিন বাদে বিকেলের দিকে বড় কাকা স্নান করে, ঘোলভাত খেয়ে খবরের কাগজের আপিসে গিয়ে ছোট সম্পাদককে বললেন, “বিশ্বাস-যোগ্য কিছু পেলাম না, স্যার । তবে প্রাণ হাতে নিয়ে, বাঁশবাজি করে পালিয়ে আসতে পেরেছি, সেই যথেষ্ট ।”

ছোট সম্পাদক চশমা খুলে রেখে বললেন, “এতদিন কোথায় ছিলে ?” বড় কাকা অবাক হয়ে বললেন, “জ্বর এসেছিল, স্যার । ভাবতে পারেন টগবগে গরম জলের পুকুরের পাশে টলটলে ঠাণ্ডা জলের পুকুর ? সেখানকার সবাই দিনে ঘুমোয় আর রাতে নাইট ডিউটি দেয় ? তিন

মানুষ উঁচু, এক মানুষ পুরু, দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক গাঁ—" ছোট সম্পাদক বাধা দিয়ে বললেন, "আজগুবি গল্প রাখ। তুমিও যে ব্যোমকেশ বলে আমাদের খ্যাপা সংবাদদাতার মতো হলে, সে লিখেছে ঐ অঞ্চলে নাকি একটা গ্রাম আছে, সেখানকার সবাই আবহমানকাল থেকে চোরাই-কর্ম ছাড়া কিছু করেনি, এখন দেশের হালচাল পাল্টেছে, ওরাও সব পুলিশে যোগ দিয়েছে। ও অঞ্চলে আর চুরি-ডাকাতি হবে বলে মনে হয় না। দেখছো তো কষ্টে পড়লে লোকের স্বভাব কেমন শুধরে যায়। তবে এর মধ্যে কোনো বিশ্বাসযোগ্য ষ্টরি নেই।"

বড় কাকা মনে মনে কাষ্ঠ হাসলেন, "ষ্টরি নেই তো পুকুরের জলে ঘড়া ফেললে ঠং করে উঠল কেন? ও পুকুর যদি ঘড়া-প্যাঁটরায় ভরতি না থাকে তো কি বলেছি। বলে মাছ বেচারারা পালাবার জায়গা পায় না, হাত দিয়ে ধরা যায়!" এই ভেবে পকেট চাপড়াতেই মোড়লের পদ্য খড়মড় করে উঠল। বড় কাকা বললেন, "শম্ভু বলছিল ম্যাগাজিন সেক্‌শনের ঐ দুই নম্বর কলমে একটু ফাঁক পড়েছে, দুটো পদ্য গুঁজে দেব স্যার?" ছোট-কর্তা বললেন, "না, না, ওসব ছাপলে কাগজ উঠে যাবে। খেলাধুলোর বিষয় কিছু গুঁজে দাও।"

বড় কাকা উঠে পড়লেন। তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। পাড়ার "চেতলা ইয়ং মেন্‌স্"-কে দিলে সব কটা ওরা খুশি হয়ে ওদের 'ডামা-ডোলে' ছেপে দেবে, যেই শুনবে ওদের ক্লাব সম্বন্ধে বড় কাকা তাদের ম্যাগাজিন সেক্‌শনের দুই নম্বর কলমে পাঁচ লাইন লিখে দিয়েছেন। মোড়লকে কয়েক কপি পাঠাতে হবে।

টুনুদা

বিমল কর

লোকে বড় হলে গুরু ধরে, আমি ন' দশ বছর বয়সে এক গুরু ধরেছিলাম। গুরুর নাম টুনু। আমার মামাতো বড় ভাই। টুনুদা বলে ডাকতাম।

আমার বাবা তখন গোমোতে। রেলে চাকরি করেন। আমরা থাকতাম রেলের কোয়ার্টারে। বাড়ির সামনে বাচ্চা বাচ্চা পাহাড়, বা পাহাড়ের মতন উঁচু উঁচু ঢিবি।

একবার মামীমা এলেন আমাদের বাড়িতে। মাসখানেক থাকবেন। শরীর খারাপ বলে জল হাওয়া বদলাতে এসেছেন। মামীমার সঙ্গে টুনুদা আর লিলি। টুনুদা আমার চেয়ে দু বছরের বড়, তার মানে বারো তেরো বছর বয়েস তার, আর লিলি আমারই বয়েসী।

গোমো জায়গাটা খুব সুন্দর ছিল তখন। ছবির মতন দেখাত। আমরা দিব্যি ছিলাম।

টুনুদারা এসেছিল জামশেদপুর থেকে। এসেই আমাকে বলল, 'আমরা একমাস থাকবো। তুই আমার চেলা হবি বুঝলি! না হলে তোর নাক ফাটিয়ে দেব।'

আমি রোগা-পটকা ভীতু ধরনের, আর টুনুদা গাঁট্টা-গোট্টা শক্ত ধরনের। দুটো ঘুঁষি ঝেড়ে আমার নাক ফাটাতে টুনুদার বেশিক্ষণ লাগবে না। তবু রাগ করে চেলা হওয়া সাজে না, অহংকারে লাগে। আমি, সত্যি বলছি, মাথা নেড়ে না বললাম।

টুনুদা বলল, 'কী! হবি না? আয় পাঞ্জা লড়ি।'

পাঞ্জায় আমি হেরে গেলাম।

টুনুদা বলল, 'এবার আয় ভেড়া লড়ি। মাথায় মাথায় ঠুকবি। কপালে গুঁতো মারবি। আমিও তোকে মারব। কাম্…।'

ভেড়া লড়াইয়েও আমার হার হল। টুনুদার কী জোড় কপালে। এক একবার মারে—আর আমি তিন পা করে পিছিয়ে যাই। কপাল ফুলে গেল আমার।

টুনুদা বলল, 'দু'বার হেরেছিস, আর একবার। এবার লেগ্ ব্রেকিং, মানে পা ভাঙা। তুই আমার পায়ে মারবি তোর পা দিয়ে, আমি তোর পায়ে মারব। বসে পড়লেই হার। আয়।'

ঘরের মধ্যে দু'জনে লেগ্ ব্রেকিং চালাতে লাগলাম। অ্যায়সা মার খেলাম যে আমার পায়ের দফারফা হয়ে গেল। হেরে গেলাম।

অগত্যা টুনুদাকে গুরুপদে বরণ করে নিলাম। গুরুকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মায়ের খুচরো পয়সা থেকে দুটো পয়সা সরিয়ে নিয়ে টুনুদাকে জিলিপি খাওয়াতে হল।

এই টুনুদা যে কত বড় গুরু আজ বুড়ো বয়েসে আমি সেটা বুঝতে পারি।

আমাদের বাড়িতে টুথপেষ্ট বলে জিনিসটা ঢোকেনি তখন। কোন বাড়িতেই বা ঢুকেছিল? মাজন দিয়ে দাঁত মাজতাম।

টুনুদার হাতে টুথপেষ্ট দেখে অবাক হয়ে বললাম, 'এটা কী টুনুদা!'

'রদফেন।'

'সেটা কী?'

'পাউরুটি দিয়ে খেতে হয়। খাবি?'

'খাব।'

গোমোতে তখন অ্যাংলো সাহেব ছিল অনেক। পাউরুটিও তৈরি হত। যেমন নরম তেমনি মিষ্টি।

টুনুদার কথা মতন পাউরুটি নিয়ে এলাম। টুনুদা রদফেন পেষ্ট লাগিয়ে দিল রুটিতে। খেতে তেমন আরাম লাগল না। ঝাঁজ লাগছিল। এমন সময় লিলি সেটা দেখতে পেয়ে গেল। দেখতে

পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এ মা! ওটা তো টুথপেষ্ট, দাঁত মাজে, তুই রুটি দিয়ে পেষ্ট খাচ্ছিস? কী ভূত রে!' টুনুদার কী হাসি। হাসতে হাসতে চিৎপাত। আর একদিন টুনুদা আমায় বলল, 'লাপ্পি খাবি?'

'লিপ্পি আবার কী?'

'অ্যাংলো মাদরাজীরা খায়। একবার খেলে আর ভুলতে পারবি না।'

'তুমি ঠকাবে না তো?'

'ঠকিয়েছি কোথায়! পেষ্ট দিয়ে পাউরুটি খেতে সবচেয়ে ভাল লাগে। আমি খাই।'

'দাঁত মাজার জিনিস কেউ খায়!'

'তুই একেবারে গাধা। খাবার জন্যেই দাঁত। দাঁতে না লাগিয়ে তুই কিছু খা তো, তোকে দশটা টাকা দেব।'

বেশি তর্ক করলাম না। গুরুর সঙ্গে তর্ক করতে নেই। বললাম, 'লিপ্পি খাব।'

'বেশ। আজ সন্ধেবেলায় তোকে খাওয়াব। কাউকে বলবি না।'

বলতে ভুলে গিয়েছি টুনুদা এসেছিল ডিসেম্বর মাসে। তখন একেবারে কনকনে শীত। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার দারুণ মজা তখন। রোজই মামীমা নানান খাবার করছে আর আমরা খাচ্ছি।

সন্ধেবেলায় লেপের তলায় বসে আমরা বাচ্চারা খুব গল্প করছি, আর লুডু খেলছি। দারুণ খেলা জমে উঠেছে। কচা ক্কচ্ কাটাকুটি, লিলি চেঁচাচ্ছে, ঝুনু কাঁদছে। টুনুদা তার শেষ গুটি ঘরে তুলে দিয়ে লাফ মেরে উঠে পড়ল। বলল, 'নে তোরা শেষ কর, আমি আসছি।'

মা, মামীমা আর বাবা গিয়েছে কাছাকাছি একটা বাড়িতে বেড়াতে। আমরাই রাজত্ব করছিলাম।

ঝুনু, আমার বোন, প্রায় উঠে যাচ্ছিল তার শেষ গুটি নিয়ে, লিলি কচাং করে কেটে দিল। ঝুনু একেবারে হাউমাউ করে উঠল। এমন সময় টুনুদা এসে হাজির। বলল, 'নে, লিপ্পি খা।'

বস্তুটা ভাল করে দেখলামও না। আমার শেষ গুটিটা নিয়ে পোঁ পোঁ করে পালাচ্ছি। লিলি আমায় তাড়া করছে।

টুনুদা একটা কাপ এগিয়ে দিল। কাপের মধ্যে কালো মতন জলজল কিছু যেন রয়েছে। তার মধ্যে একটা বড়া।

আমি সোঁ করে একটা টান মারলাম কাপে। মন্দ লাগল না, সামান্য তেতো তেতো তার সঙ্গে টকমিষ্টি।

ছক্কা চালতে চালতে আবার এক চুমুক খেলাম। এবার ঝালটা জিবে লাগল।

তারপর বড়াটা মুখে নিলাম। মুখে দিয়েই কেমন গা গুলিয়ে গেল। পাছে বিছানায় বমি করে ফেলি তড়াক করে লাফ মেরে এক ছুটে বাইরে।

বমি হল না। বড়াটা তো খাইনি। মুখে ছিল। বাইরে গিয়ে ফেলে দিলাম। মুখ ধুয়ে ঘরে এলাম আবার। বিচ্ছিরি লাগছিল। ঝুনু জানতে চাইল—'কী খেলি রে?'—বললাম, 'লিপ্পি।'

'লিপ্পি কী?' ঝুনু জিজ্ঞেস করল।

টুনুদা বলল, 'মাদরাজীরা খায়। খাবি? এতে ভাল ভাল জিনিস আছে। তেঁতুল, লঙ্কা, চেরতার জল, মধু, কাঁচকলা আর তেলা পোকা সেদ্ধ, তার সঙ্গে জিনজার। মানে আদার রস।'

টুনুদার কথা শুনে ঝুনু নাক মুখ চাপা দিয়ে বমি করতে ছুটল।

আমার যে কী অবস্থা কেমন করে বলব!

এই টুনুদাই জামশেদপুরে ফিরে যাবার আগে আমায় খুব দুঃখ করে বলল, 'চেলা, আমি তোর সঙ্গে শুধু ঠাট্টাই করলাম। তোকে এবার সত্যি সত্যি একটা ভাল জিনিস খাওয়াব।'

আমি বললাম, 'না টুনুদা, টুথপেষ্ট আর পাউরুটি খেতে খারাপ নয়।'

টুনুদা বলল, 'এবার তোকে ডিম-ছানা খাওয়াব।'

ডিম-ছানা আবার কী জিনিস? শুনে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আমি বললাম, 'ডিম থেকেই তো ছানা হয়।'

টুনুদা বলল, 'তুই কিস্যু জানিস না। ডিম-ছানা হল সার্কাসের ট্রাপিজ খেলোয়াড়দের খাবার। ট্রাপিজ খেলা দেখেছিস, আকাশে লাফালাফি করে।'

'একবার দেখেছি।'

'তা হলে বোঝ, কত গায়ের জোর হয় ডিম-ছানা খেলে।'

'তুমি আবার ঠকাবে?'

'না। ভদ্দরলোকের এক কথা। তুই আমার চেলা, তার ওপর ভাই। তোকে একটা ভাল খাবার খাইয়ে যাব যাবার আগে। তুই পরশু দিন গোটা চারেক ডিম জোগাড় কর।'

টুনুদাকে পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। আবার খানিকটা বিশ্বাসও হল। হাজার হোক চলে যাচ্ছে জামশেদপুরে, যাবার আগে কি আর দুষ্টুমি করবে!

অনেক কষ্ট করে দুটো ডিম জোগাড় করে দিলাম টুনুদাকে।

টুনুদা আমাদের বিলাস পাঁড়ের ফাঁকা ঘরে গিয়ে কাঠকুটো জ্বালিয়ে ডিমের বড়ার মতন কি একটা ভাজল। রঙ হল মালপোর মতন লালচে কালো।

শালপাতায় করে খেতে দিল আমাকে।

খেলাম খানিকটা, ভয়ে ভয়ে। খেতে যে খুব খারাপ লাগছিল তা নয়—তবে তেতো তেতো লাগছিল।

বললাম, 'জিনিসটা কী বললে না?'

'শুনবি? তা হলে শোন···তোকে শিখিয়ে রাখি। ডিম ফেটিয়ে তাতে নুন দিবি, লঙ্কা দিবি কুঁচিয়ে, পেঁয়াজ দিবি, সোডা দিবি, আর একটা আধ আঙ্গুল সাইজের টিকটিকির বাচ্চা···! কী হল রে?'

আমার যা হয়েছিল আজও তা মনে আছে। তিন দিন একটানা বমি করেছি। আর টুনুদার পিঠের ছাল বলে কিছু ছিল না। অবশ্য বেচারী সত্যই আর টিকটিকির ছানা দেয়নি। কিন্তু কে আর সে কথা শুনছে!

দাদুর বেড়াল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভোরবেলা হরি-নারায়ণঅ, হরি-নারায়ণঅ, বলতে বলতে দাদু আমাদের ঘরের সামনে এসে রোজ যেমন দাঁড়ান তেমনি দাঁড়ালেন। রোজকার মতই আকাশে তখন সবে আলো ফুটছে। একটা কি দুটো পাখি ঘুমচোখে আমার পড়া মুখস্ত করার মত কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ডাকছে। দাদুর 'ওজন' ভরা বাতাস বইছে। বাতাস অবশ্য নেই আজ। শেষ রাতে তেড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা। শুয়ে শুয়ে, চোখ পিট পিট করে আমি আকাশ দেখে নিয়েছি। চারপাশ নিস্তব্ধ গুমোট। দাদু রোজ যেমন ডাকেন সেই রকম ভারি ভাবগম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'খোকা উঠে পড়। আমি এগোচ্ছি।' দাদুর গলা শুনে বাবা রোজ যেমন ঘুমচোখে পাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আমার ডান কানটা ধরে বার কতক নেড়ে দেন সেই রকম নেড়ে দিলেন। আমি রোজ যেমন ধড়মড় করে উঠে বসে, দু'হাঁটুতে মাথা গুঁজে বলি, 'যান, আসছি' ঠিক সেই রকমই বলে, সামনে পেছনে দুলুনে চেয়ারের মত দুলতে লাগলুম। এই ভাবে দুললে ঘুম মাথা ছেড়ে পায়ের দিকে নেমে যায়। এই সময়টায় রোজ আমার যেমন হিংসে হয় তেমনি হল। বাবা কেমন আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবেন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অঙ্ক করেন, তাই দাদু তাঁকে ঘুমোবার অনুমতি দিয়েছেন। আমি রাতে জাগতেও পারি না, জাগার অনুমতিও নেই। দাদু বলেন, বৃদ্ধ আর শিশু হল পাখির মত। ভোরে উঠে কলরব করবে। দাদু যেমন হরি নারায়ণঅ, হরি নারায়ণঅ করছেন। আমি বলেছিলুম, তা হলে ত পাখির মত সন্ধ্যে

বেলাই শুয়ে পড়া উচিত। না, তা হবে না। এ পাখি হল প্যাঁচা আর কাকের মিশ্রণ। রাত দশটা পর্যন্ত হুতোম প্যাঁচা। ডানা মুড়ে, লাল চোখে টেবিলের সামনে। খোলা বই। মাস্টার মশাই। কিন্তু ভোরে কাক। এ পাখি, নতুন জাতের পাখি—প্যাঁকাক'।

দাদুর পরনে ন-হাতি পট্টবস্ত্র। ধবধবে বিশাল বুকে ইয়া মোটা সাদা পইতে। পায়ে খটাস খটাস খড়ম। হাতে বেতের সাজি। আর এক হাতে অর্ডার দিয়ে তৈরি করান অ্যালুমিনিয়ামের আঁকসি। বাঁশের আঁকসি রোজ রোজ খুলে যায় বলে, বাবার প্ল্যানে এটা তৈরি করে দিয়েছেন দাদুর এক মক্কেল। ইচ্ছেমত বড় ছোট করা যায়। স্বর্ণচাঁপা গাছ থেকে যখন ফুল পাড়া হবে আঁকসি তখন বড় হবে। রক্তকরবীর কাছে এসে একটু ছোট হবে, টগরে এসে আরও ছোট। বাড়ি ঢোকার সময় ছাতার মাপ। আমি দাদুর ফুল তোলার সঙ্গী। ফুল তোলার পর এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দাদু আমাকে ছোটাবেন কিছুক্ষণ। তারপর কান ধরে কুড়িবার ওঠ-বোস। আমার বয়েসে দাদুর নাকি ওজন ছিল চল্লিশ সের।

আমি যখন বাগানে গেলুম দাদুর সাজিতে ততক্ষণে জবা কিছু টগর আর গুলঞ্চ মুখ বার করে বসে আছে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেরা যেন ফোলা ফোলা মুখে টাব-গাড়ি চেপে চলেছে। আমি যেতেই দাদু বললেন, 'মিলিটারিতে কি নিয়ম জান? ফল-ইন বললেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। একটু দেরি হলেই সাজা। পিঠে ওজন নিয়ে সাত মাইল দৌড়। কি করছিলে এতক্ষণ?'

রোজ যা হয় তাই হয়েছিল। আমি খাটের দেয়ালের দিকে, বাবা ধারের দিকে। পা না সরালে নামি কি করে? গুরুজনকে ডিঙিয়ে নামতে নেই। শাস্ত্রে আছে। বললুম, 'পায়ে আটকে গিয়েছিলুম'

দাদু কি শুনলেন জানি না। বললেন, 'ভেরি গুড। ব্যায়ামের ফল ফলবেই। পা বড় হচ্ছে। মানুষের বাড় ত পায়ের দিক থেকেই হয়। গাছের মত আর কি! নিচের দিক থেকে ওপর দিকে বেড়ে

ওঠে। সজনে ডাঁটা, বটের ঝুরি, মাথার চুল, দাড়ি এ সব বাড়ে নিচের দিকে! মানুষ বাড়ে ওপর দিকে।'

কথা বলতে বলতে দাদু আঁকসিটা বড় করে ফেললেন। তার মানে এইবার স্বর্ণচাঁপার ওপর আক্রমণ চলবে। বাগানে পাশাপাশি দুটো চাঁপা গাছ। গেটের দু'পাশে লম্বা প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষাকাল। তলায় বড় বড় ঘাস হয়েছে। পাতা-টাতা পড়েছে অনেক। দাদু একটা কথা প্রায়ই বলেন, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। আজও তাই বললেন। বলে, আঁকসি দিয়ে ঘাসের ঝোপ দুলিয়ে দিলেন। ঘাসে সাপ থাকতে পারে। খোঁচা মেরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনবার হরিনারায়ণঅ বলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। তিনি জেগে থাকলে প্রথম খোঁচাতেই ফোঁস করে বেরোবেন। ঘুমিয়ে থাকলে শেষ হরিনারায়ণেই ফণা তুলে উঠবেন।

ঘাস-ঝোপ দুলে উঠল আর ফোঁস শব্দ নয় অস্পষ্ট একটা মিউ ডাক শোনা গেল। দাদুর কাঁধে পালোয়ানের লাঠির মত আঁকসি হাতে সাজি, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কিছু শুনতে পেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিউ।'

দাদু আরও ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'এদিকে এসো।'

এগিয়ে গেলুম। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

ঘাস আর পাতার আড়ালে ছোট্ট একতাল তুলোর মত একটি বেড়ালছানা। এত ছোট যেন চীনে বাদামের খোলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। শেষ রাতের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।

'তুলব দাদু!'

'নিশ্চয় তুলবে। জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

'মা কিন্তু বেড়ালের নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। দেখলে কি হবে বুঝতে পারছেন?'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি আগে ওটাকে তোল।'

তৃণশয্যা থেকে ভিজে বেড়ালছানাটাকে বুকে তুলে নিলুম। ধবধবে সাদা। প্রায় মরেই এসেছে। ঠাণ্ডায় চোখদুটো বুজে আছে। খুলতে পারছে না। ডাকার শক্তি নেই। গায়ে ছিট ছিট কাদা লেগে আছে। দাদু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'শয়তান!'

'কে শয়তান দাদু?'

'যে এ বেড়াল শিশুটিকে এই ভাবে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। সারারাত নিজে শুয়ে রইল নরম বিছানায় পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে। আর এই জীবটাকে ফেলে রেখে গেল মৃত্যুর মুখে। ভগবানের আদালতে তোমার বিচার হবে। তুমিও বেড়াল হবে। তোমার মত আর এক শয়তান এই ভাবে ফেলে রেখে যাবে। আর তখন আমি তোমাকে তুলব না।'

'কি করে বুঝবেন দাদু যে, সেই বেড়ালটা বেড়াল-রূপী শয়তান?'

'দেখলেই বুঝতে পারব। ঘুটঘুটে কালো রঙ, বুরুশের মত লোম, কর্কশ গলা। সে আমি দেখলেই চিনব।'

'বাবা কিন্তু ওসব একেবারেই বিশ্বাস করেন না।'

'তোমার বাবা ঘোড়ার ডিম জানে। অঙ্ক ছাড়া কিছুই জানে না। ভূত আছে কিনা তাই জানে না। বলে ভূত আবার কি? আমি ম্যাথমেটিসিয়ান। প্রমাণ ছাড়া কিছু মানতে রাজি নই। তাহলে তোমার অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যটা কি? শূন্যর কোনো প্রমাণ আছে? তুমি বড় তর্ক কর! ঠিক বাপের ধাতটি পাচ্ছ! নাও, ওর বুকের কাছে কানটা ঠেকিয়ে দেখ ত ধুকপুক করছে কিনা?'

বেড়ালটাকে এতক্ষণ বুকের কাছে চেপে ধরেছিলুম। জামাটা ভিজে উঠেছে। সামান্য নড়াচড়া করছে যখন, বোঝাই যায় বেঁচে আছে। আবার কান লাগিয়ে নোংরা করি কেন? 'বেঁচে আছে দাদু। নড়াচড়া করছে।' বেড়ালটা ঠিক এই সময় আমার বুকের কাছে আর এক বার মিউ করে উঠল। ঠাণ্ডায় চোখ জুড়ে গেছে। পৃথিবীকে দেখতেই পাচ্ছে না। আমাকে ত নয়ই। তবু মুখটা আমার মুখের দিকে তুলে এমন করুণ সুরে মিউ করে উঠল! ভীষণ মায়া লাগল। মায়ের কোল

থেকে ছিনিয়ে এনে বৃষ্টির রাতে আমাদের বাগানে চুপি চুপি ফেলে দিয়ে যে চলে গেছে সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। দাদুর আদালতে তার নামে মামলা করা উচিত। মিউ ডাকে বেড়ালটা যেন বলতে চাইছে, তোমাদের হাতেই আমার জীবন মৃত্যু। বাঁচালে বাঁচব, মারলে মরব। ইস্, রাতে কুকুরেও ত মেরে ফেলতে পারত !

দাদু বললেন, 'নাও ওকে ভেতরে নিয়ে চল। হট্ ব্যাগ দিতে হবে। হট্‌বাথ করাতে হবে।'

'ভেতরে নিয়ে যাব কি করে দাদু ? কুকুর আছে না ?'

'হ্যাঁ তাই ত ! আমি তখনই তোমার বাবাকে বলেছিলুম, কুকুর-টুকুর না পোষাই ভাল। এক বাড়িতে কুকুর আর বেড়াল রাখা যায় না। জন্মশত্রু।'

'না দাদু, তখন ও কথা আপনি বলেন নি। বলেছিলেন কুকুর মানুষের বেস্ট ফ্রেণ্ড। প্রত্যেক সভ্য মানুষের কুকুর পোষা উচিত। আর তখন আমাদের বাড়িতে কোনও বেড়াল আসে নি।'

দাদু রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি এই জীবন মরণ সমস্যার সময় তর্ক করতে চাই না। আমাকে একটা রাস্তা বের করতে হবে।'

'কি রাস্তা বের করবেন দাদু ? একে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেই আমাদের টম সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে ফেলবে।'

'হ্যাঁ, করলেই হল ? করে দেখুক না ! মেরে শেষ করে দেব।'

'মা ত বলেন, আমরা দু'জনেই নাকি আপনার আদরে বাঁদর হয়ে গেছি।'

'আদরে বাঁদর হয় না, মানুষ হয়। তোমার মা তোমার বাবার মতই। সবজান্তা।'

রাস্তা দিয়ে ব্রঙ্কাইটিসের কাশি কাশতে কাশতে নেত্যকালীবাবু প্রাতর্ভ্রমণে চলেছেন। প্রতিবার কাশির ধমক থামলে তিনি একবার 'ওরে বাবা' বলে গোটা কতক কথা বলেই আবার কাশিতে চলে যান।

তার মানে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়, কাশি, ওরে বাবা, কথা, কাশি, ওরে বাবা, কথা।

রোজ আমাদের বাড়ির সামনে এসেই নেত্যকালীবাবুর একটা কাশির দমক আসবে। আজও তাই এসেছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে কাশছেন। দাদু যেন আশার আলো দেখলেন। অন্যদিন নেত্যবাবু কথা বলতে চাইলেও দাদু, হাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা করে এড়িয়ে যান। আজ নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ও নেত্য, নেত্য।' নেত্যবাবুর কাশি তখনও চলছে। একটা হাত তুলে বোঝাতে চাইলেন, শুনেছি, শুনেছি, উত্তর দিচ্ছি। দাদুর তো সবেতেই অধৈর্য। মুখ দেখলেই বোঝা যায় গলা টিপে কাশি থামাবার ইচ্ছে হচ্ছে। অবশেষে থামল। সোজা হয়ে নেত্যবাবু বললেন, 'ওরে বাবা, কি বল?'

'একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে?'

'অ্যাঁ, কি বললে?'

'তুমি কানেও কি আজকাল কম শুনছ? কি শরীরই করেছ! একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে?'

নেতাবাবু এই সাত সকালে এমন একটা দানের প্রস্তাব স্বপ্নেও মনে হয় ভাবেন নি। নাক মুখ সিঁটকে বললেন, 'রামোঃ বেড়াল! বেড়াল আবার মানুষে নেয়। গরু হলে নিতে পারি।'

দাদু রেগে বললেন, 'ভাগো, ভেগে পড়! স্বার্থপর। কেন, তোমার অত বড় বাড়ি, একটা বেড়ালকে মাস-খানেক আশ্রয় দিতে পার না! তারপর ত বড় হয়ে নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে।'

'সে ত তুমিও দিতে পার। তোমারও ত বেশ বড় বাড়ি, বাগান।'

'আরে মূর্খ, আমার বাড়িতে যে বাঘের মত একটা কুকুর। সাধে তোমাকে বলছি!'

'দেখ মুকুজ্যে, বয়েস তোমারও কিছু কম হল না! কুকুর, বেড়াল, পাখি! আর জড়িয়ে পড়ো না, মায়া কাটাও। মনে কর, শেষের-অ সেদিন-অ কিই ভয়ঙ্কর-অ।'

আবার কাশি। দাদু মুখ ঘুরিয়ে, খড়মের খটাস খটাস শব্দ তুলে

আমার দিকে সরে এসে বললেন, 'এ দেশের কোনও দিন উন্নতি হবে না। সব স্বার্থ, সব স্বার্থ।'

বাগানে এতক্ষণ আমরা কি করছি দেখার জন্য মা এসে হাজির। আমার কোলে বেড়ালছানাটাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, 'ফেল, ফেল, ফেলে দে।'

দাদু বললেন, 'তুই আমার মেয়ে হয়ে এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলতে পারলি তুলসী!'

মা বললেন, 'তুমি ওটাকে পুষবে না কি?'

'পোষা ত পরের কথা, আগে ওটাকে বাঁচাতে হবে।'

'তোমার টম ওটাকে খেয়ে ফেলবে বাবা। তুমি ও শয়তানকে জান না। ওই দেখ।'

ঘরের জানলায় সামনের পা দুটো তুলে জিভ বের করে দিয়ে টম ফোঁস ফোঁস করছে, আর বিস্কুট দেখে যেমন জিভ চোকায়, সেই রকম জিভ চোকাচ্ছে। দাদু টমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে টম। আমার টমবাবু, এটা বিস্কুট নয়, তোমার বন্ধু, ফ্রেণ্ড।' আমাকে বললেন, 'একটু কাছে নিয়ে যাও, ওকে একটু দেখাও। আমি এই সেদিন একটা ইংরিজী বইয়ের ছবি দেখেছি, কুকুরের ঘাড়ে উঠে তিনটে বেড়াল নাচছে। ট্রেনিং-এ কি না হয়।'

টমের দিকে এক পা এগোতেই, ঘাঁউ করে অ্যায়সা এক ডাক ছাড়ল, আমার কোলে মর মর বেড়ালটাও চমকে উঠল। মা দাদুকে বললেন, 'কি বুঝলে? ওর হিংসে তুমি জান বাবা। ঠিক মানুষের মত। সেদিন তপনের ছেলেটাকে কোলে নিতেই সে কি লাফালাফি! কোল থেকে ফেলে দেবে। রাগ করে তিন দিন কথা বলে নি। যেদিন দুধ খেতে চায় না, সেদিন যেই বলি—জলি, টমের দুধটা খেয়ে যা ত, অমনি এদিক ওদিক তাকিয়ে ল্যাজ ঝুলিয়ে, সুড় সুড় করে খেয়ে নেয়।'

আমাদের পাশের বাড়িতে একটা লোম-অলা কুকুর আছে। তার নাম জলি। টম তখনও জানলায় ফোঁস ফোঁস করছে। এত জোরে ফোঁস করছে, জানলার গ্রিল থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে। দাদু

বললেন, 'ম্যাথমেটিসিয়ানকে ডাক। বল আমি ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছি।'

মাকে আর ডাকতে যেতে হল না। দাদুর পরেই বাবা বাগানে আসেন। বাবাই বাগান-করিয়ে। আমরা কেবল ফুল তুলি। মাঝে মধ্যে ডাল ভেঙে ফেলে, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি।

বাবা সব শুনেছেন। শুনবেন না কেন? এতক্ষণ ধরে হই চই হচ্ছে! চশমা পরে এসেছেন। চশমা পরে এলেই বুঝতে হবে, কাজের কথা হবে, আমাকে বললেন, 'দেখি, ওর কনডিশানটা কি?'

বাচ্চাটাকে হাতে নিলেন। 'ইস, ভিজে চুপসে গেছে। একটা তোয়ালে চাই। চোখে ড্রপস দিতে হবে, আর চায়ের কাপের গরম সেঁক। ড্রপারে করে বিশ ফোঁটা টেপিডওয়ার্ম দুধ খাওয়াতে হবে। এক ডোজ অ্যাকোনাইট সিক্স এক্স!' মাকে বললেন, 'যাও, তোয়ালে নিয়ে এস।'

মা বললেন, 'মানুষের তোয়ালে!'

'হ্যাঁ, মানুষের, সেইটাই হয়ে যাবে বেড়ালের।'

মা চলে যেতেই দাদু খুশি খুশি মুখে বললেন, 'সাধে তোমাকে বলি ম্যান অফ অ্যাকসান! আচ্ছা, এটা এখন থাকবে কোথায়?'

'কামিনী গাছতলার বাঁধান বেদিতে বসে বাবা বললেন, 'এ বাড়িতে না রাখতে পারলেই ভাল হয়। টমকে বিশ্বাস নেই। ধরলে, ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেবে।' বাবা খুব চিন্তিত। মা তোয়ালে এনে বাবার হাতে দিলেন। বাচ্চাটাকে তোয়ালে জড়িয়ে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আসুন, আমরা একটু মাথা ঘামাই।' মাকে আবার ফরমাশ, 'একটা খাতা আর ডট পেন নিয়ে এস!'

বাড়িতে কিছু হলেই মাকে যা খাটতে হয়! সাজি রেখে দাদুও বসে পড়েছেন। খাতা আর ডট এসে গেল। মাকে বললেন, 'তুমিও বস।'

কাগজে কলমে কি হবে কে জানে? বাবা বলেন, গণিতে নাকি সব সমস্যার সমাধান আছে। আমার মনে হয় সরল করায়, কি সুদ কষায় এ

সমস্যার সমাধান নেই। টাইম অ্যাণ্ড মোশানে থাকতে পারে। যেমন, টম যদি এক লাফে ছ হাত যায় আর বেড়ালটাকে কতদূরে রাখলে টম জীবনেও ধরতে পারবে না। সেই শামুকটা, যে জীবনেও বাঁশের ডগায় উঠতে পারল না।

বেদিতে বাবা বসেছেন পা মুড়ে, আচার্যের মত। হাতে ডট পেন। সামনে খোলা খাতা। বাবা বললেন, 'আশেপাশে এই পাড়ায় কে বেড়ালটাকে রাখতে পারে? নিন ভাবুন।'

দাদু বললেন, 'বুঝলে একজনকে আমার বড় মনে ধরেছে।'

'বলুন, বলুন!'

'তোমার জ্যাঠাই মা। আমাদের মেজ বউ। খাঁটি হরিভক্ত। গলায় তুলসীর মালা। একটিমাত্র ছেলে। সেও পরম বৈষ্ণব। সখি গো বলে যখন কীর্তনে টান ধরে, গামছা মোচড়ানর অনুভূতি হয়।' বাবা লাফিয়ে উঠলেন, 'আঃ এতক্ষণে আপনি ঠিক জায়গায় এসে ঘা মেরেছেন।'

'তা হলে তুমি তোমার জাড়তুতো ভাইকে একটা চিঠি লেখ। খোকা আগে অনুমতি নিয়ে আসুক। আমি ততক্ষণ ফার্স্ট এড দি।'

বাবা চিঠি লিখতে লাগলেন, 'প্রীতিভাজুনুষু গোপাল, পৃথিবীতে পরের জন্যে বাঁচাটাই সবচেয়ে বড় বাঁচা।' আর দাদু কোলের উপর বেড়াল ফেলে হাতে আই ড্রপসের শিশি নিয়ে বলছেন, 'দেখি, চোখ দুটো একটু মেরামত করে দি!' বাবা চিঠি লিখতে লিখতে বলছেন, 'ওষুধের গায়ে নির্দেশটা একবার পড়ে নিন। বেড়ালের চোখে দেওয়া যায় কি না! মা একটু দুধ আর তুলো এনেছেন। এলাহি ব্যাপার! ওদিকে টম ভুক্ ভুক্ করছে। বেশি জোরে ডাকতে পারছে না, পাছে আমরা ভাবি হিংসে হয়েছে। আবার চেপে রাখতেও পারছে না। কাশির মত।

বাবার জ্যাঠাইমা, মানে আমার দিদা, বৈষ্ণব হলে কি হবে, ভীষণ রাগী। সব সময় রাগ রাগ চোখে তাকান। অ্যাই জুতো খোল। জুতো খোল। রাস্তায় কিছু মাড়াস নি তো? গঙ্গাজল ছিটো। আ-হা-হা, বিছানার চাদরটা কুঁচকে দিলি কেন? আবার ঠাকুর ঘরে

গিয়ে কি খট খট করছিস ? এই রকম একটা না একটা কিছু নিয়ে বকাবকি করবেনই। আমি অবশ্য গ্রাহ্য করি না। আমার কাজ আমি ঠিক করে যাই।

চিঠি নিয়ে যখন গেলুম, দিদা তখন রান্নাঘরের সামনে বসে নারকোল কুরছেন। একথালা সাদা সাদা ফুলের মত নারকোল হয়েছে। বেশ লোভ লাগছে। এক চামচে চিনি দিয়ে এক থাবা মুখে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। সে হবার উপায় নেই। আমি ডাক পিওনের মত হেঁকে উঠলুম—

'চিঠি।'

'কার চিঠি ?'

'বাবার। এই নিন।'

দিদা দু হাত গুটিয়ে নিয়ে, মুখ চোখ কেমন করে বললেন, 'ছুঁয়ো না, বাসী জামা কাপড় ছেড়েচো ?'

'কখন, কোন সকালে !'

'দাও চিঠিটা আমার হাতে আলগোছে ফেলে দাও। দশ পা দূরে বাড়ি, চিঠি লেখার কি হল ? তোমার বাবা যে কত কায়দাই জানে ! যাও, ঘর থেকে চশমাটা এনে দাও। দেখো এক করতে আর-এক করে বোসো না যেন। তোমার হাত পা-কে আমার বিশ্বাস নেই।'

চশমা এনে দিদার হাতে দিতে না দিতেই কাকু বাজারের থলে হাতে বাড়ি ঢুকলেন। বেশ হাসি হাসি মুখ। মনে হয়, ভাল মোচাই পেয়েছেন। নারকোল কোরা হচ্ছে যখন।

'কি রে, সকাল বেলাই ?' বাজারের থলেটা দেয়ালে কাত হল। দিদা খ্যাঁক করে উঠলেন—

'ওখানে কাল রাতে চটি ছেড়েছিলি, মনে আছে ?'

'ওখানে কোথায় গো ? সে ত ওইখানটায়।'

'তুই আমার চেয়ে ভাল জানিস ?'

'আমার জুতো, আমি জানব না, তুমি জানবে ?'

'হ্যাঁ, আমাকেই জানতে হয়।'

'আচ্ছা বাবা, এই নাও।' কাকু ব্যাগটা তুলে দিদার সামনে নামিয়ে দিলেন।

'এই নে চিঠিটা পড়। তোর দাদা লিখেছে।'

কাকু চিঠিটা নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। 'স্নেহভাজনেষু গোপাল, ভক্ত আর দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে তোমার একটা পরিচয় আছে। ত্রিসন্ধ্যা না করে জল স্পর্শ কর না। শ্রীচৈতন্যের নামে তোমার চোখে জলের ধারা নামে। তোমার উদারতার পরিচয় আগেও কয়েকবার পেয়েছি। আশা করি আর একবার পাব। আমাদের বাগানে আজ কে বা কারা একটি বেড়ালছানা ফেলে দিয়ে গেছে।'

দিদা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'হবে না, বেড়াল-টেড়াল হবে না।'

কাকু আশ্চর্য হয়ে বললেন. 'কি হবে না হবে না করছ? এখনও চিঠিটার এক প্যারা বাকি।'

'ওই প্যারাতে আছে, আমাদের বাড়িতে কুকুর, বেড়ালটাকে তোমরা রাখো। বেড়াল বৈষ্ণব নয়। কথায় বলে বেড়াল তপস্বী। ও আপদ আমি ঢুকতে দোব না।'

'আহা, চিঠিটা তুমি শোনোই না।'

দিদা জোরে জোরে নারকোল কুরতে লাগলেন। খুব রাগ হয়েছে। কাকু বাকি অংশ পড়ছেন, 'এতটুকু একটি প্রাণী। অতি অসহায়। করুণ মিউ মিউ ডাকে জগতের কৃপা ভিক্ষা করছে। ওদিকে লোলুপ কুকুর অপেক্ষায় আছে, পেলেই ছিঁড়ে খাবে। আমার জ্যাঠাইমার দয়ার শরীর।'

সঙ্গে সঙ্গে দিদার প্রতিবাদ, 'না, আমার দয়ার শরীর নয়।'

'হ্যাঁ, তোমার দয়ার শরীর।'

'মুখে মুখে তর্ক করবি না গোপাল।'

'তোমার দয়ার শরীর না হলে, আমার দয়ার শরীর হয় কি করে?'

'তুমি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।'

'না আমি দেবকুলে···'

দিদা ভীষণ ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর।'

কাকু সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করলেন, 'বেড়াল বড় হলে আর বাড়িতে থাকে না। স্বাবলম্বী সন্তানের মতই গৃহত্যাগ করে। অতএব মাত্র এক মাসের জন্যে বেড়ালটাকে তোমার নিরাপদ আশ্রয়ে রাখলে বড়ই বাধিত হব। আমি রোজ সকালে এক পোয়া পরিমাণ দুধও পাঠাব। কিংবা দুধের টিন। যেটা তোমার সুবিধে। প্রীত্যন্তে।'

কাকু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়ালটা কেমন দেখতে রে?'

'দুধের মত সাদা।'

'ন্যাজ?'

'ন্যাজটা জলে ভিজে গেছে ত। সেভাবে লক্ষ্য করি নি।'

'যাক, ঠিক আছে। তুই তা হলে নিয়ে আয়। আমার অনেক দিনের বেড়ালের শখ। হ্যাঁ রে, বড় হলে ন্যাজটা বেশ মোটা হবে ত? ন্যাংলা ন্যাজের বেড়াল আমার দু চক্ষের বিষ।'

'হ্যাঁ কাকু, মোটা হবে। যেটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় মোটা ধাতের ন্যাজ।'

দিদা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'গোপাল!'

কাকু হুঙ্কার ছাড়লেন, 'মা!'

'তুই বেড়াল এনে দেখ।'

'হ্যাঁ, দেখবই ত।'

আমি পালিয়ে এলুম। এসে দেখলুম সুন্দর দৃশ্য। দাদু তোয়ালে জড়ান বেড়াল কোলে আর বাবা পেনসিল উঁচিয়ে বাগানের পথে এপাশ ওপাশ পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—

'রিপোর্ট কি? রিপোর্ট কি?'

আমি একটু চেপে-চুপেই বললুম। সবটা না বলাই ভাল।

'কাকু বললেন, নিয়ে আয়, আমি ত একটা বেড়ালের অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দেখলে ত আমি তোমাকে কি বলেছিলুম? ভক্তরা স্বপ্ন পায়। ভগবান বেড়ালের রূপ ধরে আসছেন। নিশ্চয়ই

ভোরের স্বপ্ন। তা হলে আর দেরি কেন? যাত্রা শুরু করিয়ে দি, দুর্গা বলে। পুজোটুজো সব মাথায় উঠে গেছে হে। ফুল শুকিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, তা হলে যাত্রা শুরু হোক।'

আমার পিসতুতো বোন রেখা এসে গেছে। পাশেই থাকে। ঠিক হল আমরা লটবহর নিয়ে যাব। মাদ্রাজ থেকে বাবা আঙুর এনেছিলেন, সেই আঙুরের বাস্কেটটা এল। বেড়াল নাকি বাস্কেটে শুতে ভালবাসে। বাবা বিলিতি বইয়ে ছবি দেখেছেন। নরম টার্কিশ তোয়ালে ত এসেই আছে। স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে আধ গেলাস দুধ এল। একটা স্টিলের প্লেট এল। সব রেডি। এইবার স্টার্ট। বাবা বেড়ালটার কপালে হাত রেখে বললেন, 'মানুষ হয়ে এসো মানু।'

দাদু আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি অনেক বড় হবে।'

বাবা সব দেখে-টেখে বললেন, 'আর একটু সাবধান হওয়া ভাল, কি বলেন?'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। কি করতে চাও বলো?'

'একটা ছাতা চাই।'

'কেন বল তো? রোদ লাগবে?'

'রোদ নয়, যে কোন সময় কাক আর চিল ছোঁ মারতে পারে।'

'ঠিক বলেছ হে। একেই বলে অঙ্কের মাথা।'

সঙ্গে সঙ্গে ছাতা এসে গেল। রথের দিন পূর্ণ ঠাকুর যে ভাবে ছাতার তলায় নারায়ণের সিংহাসন নিয়ে হন হন করে হাঁটেন আমি সেই ভাবে হাঁটছি। বাবা আবার হিসেব করে বলে দিয়েছেন, মাথা থেকে ছাতা যেন দশ ইঞ্চির বেশি ফাঁক না হয়। তা হলে ছোঁ মারতে পারে। বেড়ালটা খুব কাবু হয়ে আছে। তা না হলে খচর-মচর করে কোল থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করত। পেছন পেছন রেখা আসছে। হাতে লটবহর।

রকে দিদা আর বসে নেই। কাকু এপাশে ওপাশে বাঘের মত পায়চারি করছেন। খুব রাগারাগি হয়ে গেছে দু'জনে, দিদার চশমার খাপটা এক পাশে পড়ে আছে। ওপাশ থেকে এপাশে ঘোরার মুখে

কাকু আমাদের দেখতে পেলেন, 'বাঃ বাঃ এসে গেছিস ?'

'কাকু, দিদা এত রেগে যান কেন ?'

'ও বয়েস হলেই মানুষের রেগে যাওয়া স্বভাব হয়। ' হ্যাঁ বললে না, না বললে হ্যাঁ। আমিও কি এখন কম রেগে আছি ভাবছিস ? বেরোতে দিচ্ছি না, চেপে আছি।'

'তা হলে ?'

'তা হলে আবার কি ? আমি বলেছি বেড়াল থাকবে ত থাকবে। আমি বাঘ পুষব, দেখি মা কি করে ! আগে মাসীকে দিয়ে শুরু করি।'

রেখা মেঝেতে থেবড়ে বসে সঙ্গের জিনিসপত্রের হিসেব বোঝাতে লাগল, 'এই হল তোমার বেড়ালের বাড়ি। এই ছাতাটা হল ছাদ, এই হল দুধের গেলাস, এই হল তোমার গিয়ে দুধের থালা, আর তোয়ালে।'

'ছাতাটা নয় রে রেখা। ছাতাটা নিয়ে যেতে হবে। আমরা তা হলে যাই কাকু।'

কাকু অসহায়ের মত মুখ করে বললেন, 'আমাকে একটু ট্রেনিং দিয়ে যা তরু।'

'এর আবার ট্রেনিং-এর কি আছে কাকু ? এই বাস্কেটে শুয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। আবার দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। মিঁউ করলেই বুঝবেন খিদে। ম্যাঁও করলেই বুঝবেন রাগ। ঘড়র ঘড়র করলেই বুঝবেন, কোলে উঠবে। আর মিঞাঁও করলেই বুঝবেন, পালাবার তাল খুঁজছে।'

'এই ত ওদের ভাষা, ম্যাঁও, মিঁউ, মিঞাঁও, মাঁও !

—'মাঁও-টা ত বললি না।'

'ওটা ত আমি ঠিক জানি না কাকু। বাবার কাছে জেনে এসে বলব।'

রেখা বললে, 'আমি জানি। মাঁও মানেই দুষ্টুমি করার ইচ্ছে, মাঁও মানে আও আর কি। টেবিলের ওপর থেকে একটা কিছু ফেলব। ফেলে ভাঙব।'

'আচ্ছা, তা হলে তোরা আয়।' করুণ গলা কাকুর।

'আপনি কিছু ভাববেন না কাকু, আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব, খবর নিয়ে যাব।'

দাদুর আজ আর কোর্টে যাওয়া হল না। বাবা অ্যাটম নিয়ে রিসার্চ করেন। তিনি ঠিক সময়ে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুজোটুজো সেরে দাদু সাড়ে দশটার সময় এক বাটি মুড়ি নিয়ে আরাম করে বেতের চেয়ারে বসলেন। খোলা পিঠে ইয়া মোটা সাদা এক গোছা পইতে আড়াআড়ি পড়ে আছে। দাদু বলেন, ব্রহ্মদৈত্যের পইতে। পইতেতে চাবি বাঁধা।

মুড়ি খেতে খেতে দাদু মাকে বললেন, 'বুঝলি, বেড়ালটার একটা ব্যবস্থা হওয়ায় বড় আনন্দ পেলুম। ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার মত আনন্দ।'

মায়ের অত জাঁবে দয়া নেই। 'হুঁ' বলে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। দাদু আপন মনেই বক বক করে চললেন। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে দুপুরের দিকে চলে গেল। খাওয়া-দাওয়া সারার পর দাদু বললেন, 'আয় বুড়ো, ফুরফুরে হাওয়ায় একটু ঘুমোনো যাক।'

আদর এলে দাদু আমাকে বুড়ো বলেন।

দু'জনেরই ঘুম এসে গিয়েছিল। এমন সময় নিচে থেকে মা ডাকলেন, 'জ্যাঠাইমা এসেছেন।'

নাড়া দিয়ে দাদুর ঘুম একটু পাতলা করার চেষ্টা করলুম। 'দাদু, দিদা এসেছেন।'

ঘুমের ঘোরে দাদু বললেন, 'কোন দিদা?'

'বেড়াল দিদা।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছেড়ে গেল। উঠে বসলেন। শুনতে পাচ্ছি, দিদা ওপরে উঠতে উঠতে বলছেন, 'সব সুখের শরীর। বেলা তিনটে অবদি পড়ে পড়ে ঘুম। রাজমিস্ত্রী হলে ভারায় উঠে এখনই ইট গাঁথতে হত।'

দাদুর মুখ দেখে মনে হল বেশ লজ্জা পেয়েছেন। পা নামিয়ে বিদ্যাসাগরী চটি পরছেন। দিদা ঘরে ঢুকলেন। সাদা ধবধবে থান কাপড়। চোখে চশমা। বেশ রাগ রাগ মুখের ভাব।

'এই যে, ঘুম ভাঙল ? বেশ আছেন যা হোক। যা শক্র পরে পরে। অ্যাঁ !'

দাদু উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'কেন বলুন তো ? কেন বলুন তো ?'

'কেন বলুন তো !' দিদার গলা বেশ চড়েছে। 'একটা ফাটা রেকর্ড পাঠিয়ে বেশ আরামে দিব্যি দিবানিদ্রা হচ্ছে। ও দিকে অষ্টপ্রহর মিউ মিউ করে আমাকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকু কোথায় দিদা !'

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন, 'তিনি অফিসে। তাঁর আর কি ! হাসি হাসি মুখে বলে গেলেন, একটু দেখো মা। কে দেখবে বাবা ওই জিনিসকে। একবার দুধ খাওয়াতে গেলুম। থালায় পড়ে চান হয়ে গেল। এখন আষ্টেপৃষ্ঠে লাল পিঁপড়ে ছেঁকে ধরেছে।'

দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ, বলেন কি ! বুড়ো ?'

'আজ্ঞে দাদু।'

'গ্যামাকসিন।'

মা এসে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ্য করা হয় নি। ধীর গলায় বললেন, 'উঁহু, মরে যাবে। হলুদ।'

দিদা বললেন, 'হলুদ কি গ্যামাকসিন, সে তোমরা বোঝো। বেড়ালটাকে দয়া করে নিয়ে এস। আমি দায়িত্ব নিতে পারব না।'

দিদার চড়া চড়া কথায় মায়ের মনে হয় একটু রাগ হল। আমারও বেশ রাগ হচ্ছে। মা বললেন, 'আমরা লজ্জিত ; আপনার অসুবিধে করার জন্যে। আমরা এখুনি নিয়ে আসছি।'

দাদু যেন বল পেলেন, 'তুই যাবি ?'

'হ্যাঁ যাই। জীবটাকে পিঁপড়েতে মেরে ফেলবে তা ত আর হয় না।'

আমরা দু'জনে গিয়ে দেখলুম বেড়ালটার শোচনীয় অবস্থা। কোথায় তোয়ালে, কোথায় বাস্কেট। জুতোর র‍্যাকের সঙ্গে খাটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। দুধে ভিজে লোম ড্যালা ড্যালা। ছোট ছোট থাবায়,

নাকে, কানে মহানন্দে লাল পিঁপড়ে ঘুরছে। কিছু দূরে দেয়ালে শ্রীচৈতন্য গলায় মালা পরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

মা আমাদের দলে এসে গেছেন। আর কিসের ভয়। দেখতে দেখতে পিঁপড়ের বংশ নির্বংশ। বেড়ালটাও যেন এতক্ষণে মা পেয়েছে। ঘড়ড় ঘড়ড় শব্দ করছে, আর আদুরে গলায় মিউ মিউ করে ডাকছে। বেড়াল আবার ফিরে চলল। সে যেন উলটো রথ। মায়ের আঁচলের তলায় ম্যাও। কেন জানি না, বেড়াল শব্দটা মায়ের ভাল লাগে না। একটু আদরটাদর এলেই বেড়ালকে ম্যাও বলেন। ম্যাও কোলে মা চলেছেন আগে আগে। লটবহর নিয়ে আমি পেছনে।

বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। এখনও জামা কাপড় ছাড়েন নি। দু'জনেই বেশ উত্তেজিত। আমাদের ফিরতে দেখে দু'জনেই হই হই করে বলে উঠলেন, 'ওয়েলকাম পুসী, ওয়েলকাম পুসী।'

মা ম্যাওকে আঁচলে করে টমকে ফাঁকি দিয়ে দাদুর লাইব্রেরিতে নিয়ে এসেছেন। বাবা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। টম এখন দোতলায় জানলার সামনে বসে গলা সাধছে। দাদু মায়ের কোল থেকে পুসীকে নিজের কোলে নিয়ে বললেন, 'বাঁচা গেল বাবা। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল।' তারপর বারোয়ারি তলার পুজোর নাটকের মেনীদার মত বাঁ হাতে বেড়াল ধরে, ডান হাতটাকে বাতাসে গোল করে ঘুরিয়ে বললেন, 'এই হল তোমার সাম্রাজ্য। অসংখ্য ইঁদুর ঘুরছে আইনের বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে। আইন বাঘা বাঘা অপরাধীদের কাত করলেও ক্ষুদ্র ইঁদুরের কিস্যু করতে পারে না। এইবার তুমি এসেছ। তুমি পারবে। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও।'

মা দু'হাত তুলে দাদুকে থামালেন, 'আর হাসি নয়, আর হাসি নয়। এখনও হাসির সময় আসে নি। রাত আসছে। কে কোথায় থাকবে ঠিক করুন।'

বাবার মাথা আবার ঘামতে শুরু করল। ইউরেকার মত বাবার চিৎকার, 'পেয়েছি, পেয়েছি, ডগ গেট।'

বেড়াল কোলে দাদু র‍্যাকের কাছ থেকে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন, 'ইয়েস, ডগ গেট।'

পর মুহূর্তেই দু'জনে চুপসে গেলেন, 'সে ত তৈরি করাতে সময় লাগবে!'

'তা হলে?'

আবার বাবার আবিষ্কার, 'পেয়েছি, পেয়েছি। আইন দিয়ে কুকুর ঠেকাব।'

'সে কি?'

'দেখবেন, যখন করব, তখন সেটা কি?'

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝের বড় ধাপে রাত দশটার সময় কোমর উঁচু একটা বড় র‍্যাক পড়ল, দেয়ালে দেয়ালে ঠাস হয়ে। সার সার সাজান হল ল-ম্যানুয়েলস। ইয়া মোটা মোটা বইয়ের দুর্ভেদ্য দেয়াল। দোতলায় দাদু আর বেড়াল। নিচের তলায় টম। বইয়ের পাঁচিলে পা তুলে গলা বাড়িয়ে, জিভ বের করে টম হ্যা হ্যা করছে।

বাবা বললেন, 'যতই চেষ্টা কর, আইন লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তোমার নেই। তবে তোমার আছে, কারণ তুমি বেড়াল। আপনি ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখুন। কাল সকালে মিস্ত্রী ডেকে গেট তৈরি করান হবে।'

নিচে থেকে আমরা দু'জনে দাদু আর দাদুর বেড়ালকে, 'গুড নাইট' করলুম। টম ভুক্ করল।

দাদু বললেন, 'কাল সকালে তোমরা আমাকে গুড-মর্নিং না করালে এই আইন টপকে আমার পক্ষে বাগানে যাওয়া সম্ভব হবে না যে!'

বাবা বললেন, 'আমাকে তা হলে কাল একটু বে-আইনী করে ভোরে উঠতে হবে। শুভরাত্রি'।

টম এতক্ষণ ছোট ছোট ঢেঁকুরের ভুক্ ভুক্ তুলছিল। আর সামলাতে পারল না। এবার উদাত্ত ভেউ-উ-উ!

দুই মূর্তি

শক্তিপদ রাজগুরু

চুপচাপ ক'দিন বনের মধ্যে ফরেস্ট বাংলোয় থাকবো বলে চিঠিপত্র দিয়ে চাঁইবাসার বনবিভাগের কর্তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সারান্দার গহন অরণ্যে এসেছি।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের রাজখরসোয়ানা স্টেশন থেকে বাঁ দিকে রেল-লাইনের একটা শাখা বের হয়ে বনপাহাড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে গুয়া মাইনস্-এ। বিরাট পাহাড়ের নীচে এসে বাধা পেয়ে রেললাইন থেমেছে।

এ অঞ্চলের চারিদিকে গভীর বন পাহাড়, আর সে পাহাড়গুলোয় রয়েছে দামী লোহাপাথর—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় আয়রন ওর, এ ছাড়াও আছে ম্যাঙ্গানীজ। ওই সব লোহাপাথর বিভিন্ন খনি থেকে তুলে সারা ভারতের লোহার কারখানায় চালান যায়। তারই জন্য এই গহন বনপর্বতেও রেললাইন এসেছে, নইলে এখানে লোকজন তেমন নেই। ওই গুয়ার পাহাড় পার হয়েই এখনকার সারান্দার বনরাজ্যের সীমানা।

জায়গাটা সুন্দর। বনবিভাগের কর্তাদের রুচির প্রশংসা করতে হয়। চারিদিকে উঁচু পাহাড়গুলোর বুকে গহন আদিম অরণ্য। ওই পাহাড়ের গা বেয়ে সরু রাস্তায় জিপে করে এসেছি এই ফরেস্ট বাংলোয়। এই উপত্যকায় পাহাড়ের বুক চিরে কয়না নদীর কালো জলধারা পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে বয়ে চলেছে। এই উপত্যকাকে ওই নদীটা ঘিরে

রেখেছে, তাই এ মাটিতে প্রচুর ধান মকাই বাজরার চাষ হয়। কিছু আদিবাসী হো, মুণ্ডাদের বসতি গড়ে উঠেছে।

একপাশে একটা ছোট টিলাকে কেন্দ্র করে সুন্দর ছবির মত ফরেস্ট বাংলো, সাজানো বাগান, ক্রিসেনথিমাম সূর্যমুখী প্রিমরোজ পাহাড়ী গোলাপের গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে আর কয়না নদী বয়ে চলেছে এই বাংলোর গা ঘেঁষে—আধখানা চাঁদের মত নদীটা বাঁক নিয়ে আবার গহন অরণ্যে ঢুকে গেছে। দূর থেকে দেখা যায় অন্ধকার গাছের জড়াজড়ি করে গড়ে তোলা রহস্যমাখা কোন এক আদিম জগৎ থেকে নদীটা বের হয়ে এই ছোট্ট লোকালয়ের আলোটুকুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার বনের গভীরে হারিয়ে গেছে।

আমার সঙ্গী সঞ্জীব বলে—সুন্দর জায়গাটা।

ডেকচেয়ারগুলো রোদে পেতে বসার ব্যবস্থা আছে বাগানে। বাতাসে ওঠে পাখির কলকলানি, তাতে মিশেছে কয়নার জলস্রোতের শব্দ। বিষ্টুবাবুই এই জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন আমাকে। গুয়ার কাছে বড়জামদার লোক—গুখানের নামকরা এঞ্জিনিয়ার, আর তেমনি বড় শিকারী। বহু ম্যানইটার বাঘ, বুনো 'রোগ' হাতি, খ্যাপা বাইসন মেরেছেন। এই বনকে তিনি ভালো করে চেনেন।

তিনিই বলেন—দেখতে যতো সুন্দর ভাবছেন, আসলে কিন্তু তার চেয়ে এ বন অনেক বেশী ভয়ংকর, সাবধানে থাকবেন, বাংলোর বাইরে সন্ধ্যার পর বড় একটা বের হবেন না।

বিষ্টুবাবু ফিরে যাবেন আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে। ওঁর এইসব সাবধানী কথাবার্তা শুনে অবাক্ হই।

—কেন?

—বনের চারপাশে কয়েকশো বর্গমাইল জুড়ে এই বন। এখানে বাঘ, হাতি, বাইসন, ভালুক, চিতাবাঘ সবই আছে। হরিণ, শম্বর, বন-শুয়োর তো এমনিই ঘোরে। রাতের বেলায় ওরা জল খেতে আসে নদীতে, তখন একবার দেখা দিয়েও যান ফরেস্ট বাংলোর অতিথিদের। তাই সন্ধ্যার পর সহজে বের হবেন না। আর দিনের বেলাতেও নদীর

ওপারে যাবেন না লোকালয় ছেড়ে। কথায় আছে—আপনি বন্যজন্তু না দেখতে পেলেও জানবেন তারা আপনাকে ঠিকই দেখছে।

বিরাট শালগাছগুলো পাহাড়ের গায়ে মাথা তুলেছে—কি আদিম আতঙ্কে ভরে তুলেছে ঠাঁইটাকে।

বিষ্টুবাবু বলেন—কিছুদিন থেকে একটা 'বুল বাইসন' খেপে গিয়েছে দল ছুট হয়ে, সেটা এখানে ওখানে ঘুরছে। বস্তিতেও হানা দিচ্ছে। ওটাকে মারবার জন্য পারমিশান চেয়েছি। এখনও জবাব আসেনি। ওটার জন্যই সাবধানে থাকবেন।

বৈকাল নামছে। বিষ্টুবাবু ফিরে গেছেন। ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় বসে আছি। শান্ত সবুজ বনরাজ্য, বৈকালের আলো এখানে তাড়াতাড়ি মুছে যায়, কারণ চারিদিকে এর উঁচু পাহাড়, সেই পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে গেলেই আঁধার ঘনিয়ে আসে। জায়গাটার রূপ বদলে যায়।

চৌকিদার চা দিয়ে গেছে। আমরা দুটি প্রাণী অচল স্তব্ধতার রাজ্যে যেন হারিয়ে গেছি। তেমন কোন কোলাহল নেই। শুধু পাখির ডাক আর হাওয়ার শনশনানি মিশেছে নদীর ওই স্রোতের কলশব্দে।

হঠাৎ একটা জিপের গজরানি শুনে চাইলাম। বাংলোর দিকেই আসছে সেটা। তার থেকে লাফ দিয়ে নামলো দুই মূর্তি। একজন গোল মোটামত, অন্যজন টিকটিকে লম্বা। মাথায় একটা শিখা। দু'জনের পরনেই প্যান্ট টেরিলিনের শার্ট—আর কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা, বাইনাকুলার, ফ্লাস্ক ইত্যাদি। জিপের পিছনের দিক থেকে ড্রাইভার ওদের মালপত্র বন্দুক এসব নামিয়ে এনে বাংলোর ওপাশের ঘরে তুলছে। বাংলোর চৌকিদারও গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়েছে।

সিটকেমত শিখাধারী ভদ্রলোক চিনচিনে গলায় শুধোয়—বাইসনকো দেখা? পাগলা বাইসন?

চৌকিদারও মাথা নাড়ে।

—বাইসনটা নাকি মাঝে মাঝে তাদের বস্তিতেও হানা দিয়েছে।

ছু একটা জানোয়ারকে, ঘরের বইল ভৈসাও মেরেছে। একটা মানুষকে কিছুদিন আগে পায়ে করে থেঁতলে শেষ করে দিয়েছে।

চৌকিদার বলে—হ্যাঁ সার।

সাহেবরূপী সেই শীর্ণকলেবর ভদ্রলোক যেন আশ্বাস দিচ্ছে—ঠিক হ্যায়। ফিন্ আনেসে খবর দেনা।

ওপাশে মোটামত লোকটা চক্কর-বক্কর হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে এইবার হাঁক পাড়ে—চৌকিদার!

চৌকিদার তার দিকে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকতে সে হেঁড়ে গলায় বলে—আনেসে, হম্‌কো খবর দেনা। উ শয়তানকো হম্ খতম্ করেগা। মেরা চাচাজী কিত্‌না বাইসন মারা থা—জানতা হ্যায়?

উনি কে? ওঁর চাচাজীই বা কোন্‌জন আর তিনি কতগুলো বাইসন মেরেছিলেন তার ফিরিস্তি বেচারা চৌকিদারের জানবার কথা নয়, তাই ও চুপ করে রইল। মোটকা ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই সিটকেমত ভদ্রলোক বলে—আমার চাচাজী সেবার গরু-বাঁধা খোটা দিয়ে পিটিয়ে বাইসন মেরেছিল।

কথাগুলো ওই মোটকা ভদ্রলোকের নাকের উপর ছুঁড়ে দিয়ে তার চাচাজীর হিমালয়প্রমাণ খ্যাতির কথা জানান দিয়ে সে ভিতরে চলে গেল। মোটামত লোকটি তখনও গজগজ করছে, ওর গোলমত মুখখানা ফুলে উঠেছে। কি ভেবে বোধহয় সামলে নিল নিজেকে। চৌকিদারের সামনে আর কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটাতে চায় না তাই বলে:

—ও বাইসনকো হম্ খতম্ করেগা জরুর।

চৌকিদার হাতজোড় করে জানায়—পরমাৎমা আপ্‌কো ভালা করে।

—চা বানাও। মোটা পিপের মধ্য থেকে যেন হুংকারের শব্দ ওঠে।

ভিতর থেকে চিনচিনে গলায় শিখাধারী ভদ্রলোক ফরমাশ করে—শরবত লাও, জলদি।

চুপ করে দেখছি আমরা ব্যাপারটা। চৌকিদার বেচারা যেন নাজেহাল হয়ে পড়বে এইবার ওই দুটি বীরকে সামলাতে। সরুমত লোকটি ফরমাশ করে—ভাত, সবজি ঔর দুধ রাত্‌মে খানা হোগা।

মোটকা ভদ্রলোক হুংকার ছাড়ে ওপাশের ঘর থেকে।—ফাউল আউর রুটি বানাও।

দু'জন আকৃতি আর প্রকৃতিতেও ভিন্ন। কিন্তু দু'জনের মেজাজ একই সুরে বাঁধা—অনেক চড়া পর্দায়। এ চিঁচিঁ করে তো ও গর্জায়। এ যদি ডাইনে যায়, ও যায় বাঁয়ে।

সঞ্জীব বলে—বনবাসের শান্তিটুকুও গেল দাদা, যে জব্বর শিকারী দু'জন এসেছে তাদের গুঁতোতেই পালাতে না হয়।

সন্ধ্যা নামছে। পাখিগুলো তখনও কলরব করছে—পাহাড়ের গায়ে জমাট অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে যেন পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে এই ছোট বসতিটুকুকে কি রহস্যে ভরে তুলেছে। বনের দিক থেকে বাতাসে ভেসে আসে কুর্চি, বনচাঁপা ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

এই পরিবেশে হঠাৎ মোটা ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন—আমি বীরবিক্রম সিং—ছত্রিশগড়কা রহনেবালা। মেরা বাবা চাচা সব রিয়াসৎকা খানদানী আদমী থা। মেরা চাচা কম্যাণ্ডার থা।

সামনের চেয়ারটাতে বসল সে, মড়মড় করে ওঠে বেতের চেয়ারটা। বীরবিক্রম তখন বিক্রমের পরিচয় দিয়ে চলেছে। তাদের রাজ্যে এখনও গভীর জঙ্গল আর সেখানে আছে হাতি, শের, নীল গাই, বাইসন সবকিছুই। ওর চাচার হাতেই তার শিকারের হাতেখড়ি।

বীরবিক্রম জানায়—বাইসন তো বহুত মামুলী শিকার, শিকার তো বাঘ, হাতি! ওসব হামেশাই মারতা হ্যায় হম্‌লোগ্‌।

এখানে বেড়াতে এসেছিল, কর্তাদের অনুরোধে এই সুযোগে ওই খ্যাপা বাইসনটাকেও মেরে নিয়ে যাবে।

লোকটা উঠে গেছে। রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ার ব্যবস্থা করবো, হঠাৎ সিটকে সেই লোকটিকে দেখে চাইলাম।

সঞ্জীব ওকে বিড়ালের মত সাবধানী পদক্ষেপে আসতে দেখে চাইল। প্যাণ্টপরা টিকটিকে সরু কোমরে কার্টিজ বেল্ট, তাতে লাগানো খাপসুদ্ধ হান্টিং নাইফ, মাথার শিখাটায় এর মধ্যে একটু ফুলের টুকরাও বাঁধা রয়েছে। সে-ই পরিচয় দেয়—মেরা নাম ব্রহ্মবোধ উপাধ্যায়।

ক্যা বোলতা থা উ বিক্রম ? গলা নামিয়ে বলে—পুরা নসড়বাজ হ্যায় উ ছোকরা। হ্যাঁ শিকারী থা মেরা চাচাজী। বড়া যোগীপুরুষ ভি থা।

ব্রহ্মবোধ উপাধ্যায় বলে চলেছে—সে নাকি এমন বহু শিকার করেছে। আর নিজেও নিরামিষাশী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। তার চাচাজীও ছিলেন সাক্ষাৎ অর্জুন।

সে অর্জুনের যোগ্য ভাইপো শ্রীমান ব্রহ্মবোধ জানায়—কালই দেখলায়ে গা—শিকার ক্যায়সে হোতা। বাইসনকো জরুর খতম করে গা। বিক্রম শকেগা থোড়াই।

এর মধ্যেও দেখছি ব্রহ্মবোধ বিড়বিড় করে কর জপছে। বলে—ব্রহ্মচর্য নেহি পালন করনেসে শিকারী নেহি হো শক্‌তা। রামচন্দ্র, লছমনজী—সবকোই ব্রহ্মচারী থা। আর বিক্রম গোশ্‌ত খাতা হ্যায়, সিগ্রেট পিতা হ্যায়—আর চাচাজীকা চেলা বল্‌কে ফুটানি মারতা! বিলকুল ননসেন্স।

ব্রহ্মবোধ হুঁশিয়ার করে যায়—রাত্‌কো হুঁশিয়ার রহনা, এ জঙ্গল বহুত খারাপ হ্যায়। লেকিন্‌ হমলোগ্‌ হ্যায়—ডরনা মৎ। কোই ফিকির নেহি।

ও নাকি আরও বড় শিকারী, তাই ওইসব কার্তুজ ছোরাটোরা সঙ্গে সঙ্গে রাখে। আর রাইফেলটা বোধ হয় খুব ভারী বলে ওটা বয় না সব সময়।

ও চলে যেতে সঞ্জীব বলে—ভ্যালা দুই মালের পাল্লায় পড়া গেছে। আপদ বিদেয় হলে বাঁচি। স্রেফ 'হেল্‌' করে দিলে লাইফ!

ওদিকে ব্রহ্মবোধ উপাধ্যায় তখন তারস্বরে কি সব স্তোত্র-ফোত্র আওড়ে চলেছে, আর বীরবিক্রম ফেল্ট হ্যাট, হান্টিং স্যু পরে রাইফেল কাঁধে নিয়ে বাংলোর বাগানেই খ্যাপা বাইসনের সন্ধানে ডবল মার্চ করে চলেছে।

ওদিকে রান্নাঘরে—বস্‌তির ঝুপড়িতে কারা বাতি জ্বেলেছে। বাংলোর একটু বাইরে বস্‌তির লোকদের ধান-বাজরার ক্ষেত। বুনো হাতি, শম্বর,

বাইসনের দল মাঝে মাঝে ওদের ধানখেতে হানা দিয়ে সব ফসল খেয়ে যায়, সেইজন্যে ওরা গাছের ওপর কুঁড়ে করে মাঝে মাঝে ক্যানাস্তারা পিটছে, না হয় নিজেদের অস্তিত্ব বনের জানোয়ারদের জানান দেবার জন্য ওদের হো ভাষায় গান গাইছে।

বীরবিক্রম বোধহয় ওদের সাহসেই বাংলোর লনে হাতিয়ারবন্ধ হয়ে চৌকি দিচ্ছে। সেই খ্যাপা বাইসনটা এলে হয়।

রাত একটু বেশী হতেই আর তাকে দেখা যায় না। ভাবলাম রাতে একটু ঘুমুতে পারবো নিশ্চিন্ত হয়ে। বৈকাল বেলায় ওই দুটি প্রাণী বাংলোয় আসার পর থেকে এখানকার শান্ত আবহাওয়াটাকে বিষিয়ে তুলেছে। দু'জনের মধ্যে ভাবও যতো আর ঝগড়াও ততো। বেশ আছে কথাবার্তা বলছে। হঠাৎ কার আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে কে একটু তুচ্ছ কথা বলেছে, ব্যস্, অমনি বেধে যায় আর কি!

খাবার টেবিলেই বেধেছিল আবার। আমিষ নিরামিষ নিয়ে। সিটকে ব্রহ্মবোধ বেশী শয়তান। ওর ফোড়ন কাটাতেই জ্বলে ওঠে বীরবিক্রম।

ঘোষণা করে সে—হম্ ছত্রি হ্যায়!

কোনরকমে থামানো গেছে।

তাই সঞ্জীব বলে—ওরা দুটোতে চুলোচুলি করুক দাদা, চলুন এ বাংলো ছেড়ে অন্য বাংলোয় যাই। শুনেছি থল্‌কোবাদ বাংলোও বেশ সুন্দর।

রাতের বেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় বিকট শব্দে। চমকে উঠলাম! ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। কাচের শার্সির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় চাঁদের আলো ভরা বনভূমি—শান্ত, জনহীন ক্ষেতের সীমানা পার হয়ে গাছগুলো উঠে গেছে সোজা। পাহাড়ের বুকে ঘন অন্ধকার—সেখানে আলো ঢোকেনি। আর ঊর্ধ্বাকাশে দু'চারটে তারা ঝকঝক করছে। কুয়াশার ফিকে আভাস মিশেছে চাঁদের আলোয়—এ যেন স্বপ্নরাজ্য।

কিন্তু আওয়াজটা উঠছে কি পৈশাচিক বিভীষিকা নিয়ে! কে

জানে বাঘ না হয় সেই খ্যাপা বাইসনটাই গর্জন করছে বোধ হয়। সঞ্জীব কান করে শুনে বলে, নাক ডাকছে দাদা।

—নাক! অবাক হই। যদি এমন হুংকার কারো নাক থেকে নির্গত হতে পারে তাহলে সেটা নাক নয়, বোধহয় বিরাট একটা বিউগিল। ডাক শুনলে তাক্ লেগে যায়। একটা বিরাট ট্রাক যেন কাদার মধ্যে ঢুকে গেছে। ড্রাইভার সেটাকে তোলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এঞ্জিনের যত শক্তি আছে তাই দিয়ে এঞ্জিনটা গর্জন করছে।

ভোঁ···ভর্-র্···র্ ফোঁ ও···স্! ভোঁ···ও

যেন আমাদের কুলেপাড়ার ক্লাবের ব্যাণ্ড বাজছে রকমারি শব্দে।

রাতের ঘুম বোধহয় মাথায় উঠে যাবে। সঞ্জীবের কথাটা ভাবছি। অন্যত্র পালাতে হবে এদের জ্বালাতেই।

তবু ঠাণ্ডায় ঘুমটা এসেছিল অনেক পর। আর ঘুমিয়েও পড়েছি।

সঞ্জীবের ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে উঠলাম। সকাল হয়ে গেছে। পাহাড়ের সীমা পার হয়ে তখনও সূর্যের দেখা মেলে না এই উপত্যকায়, কিন্তু ফরসা হয়ে গেছে। পাখিগুলো কলরব করছে।

সঞ্জীব চোখ মুখ কপালে তুলে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে। ও বলে—শীগ্‌গির উঠুন! ওপাশের ঘরে সেই ব্রহ্মবোধ উপাধ্যায়কে বোধহয় খুন করে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। মাথা নীচু করে ঝুলছে মনে হল।

ঘুম মাথায় উঠে গেছে ব্রহ্মবোধের ওই দুর্বোধ্য ব্যাপার শুনে। কে জানে বনের মধ্যে এসব কাণ্ডও ঘটা সম্ভব। তবু অবাক্ হয়ে শুধোই—ঠিক দেখেছিস?

—চলো না, তুমিও দেখবে। জানলা দিয়ে ওই দৃশ্য দেখে আমি আর দাঁড়াইনি। সঞ্জীব হাঁপাচ্ছে তখনও।

বের হয়ে ওপাশের জানলার দিকে এগিয়ে যাই। প্রথমেই পড়ে বীরবিক্রমের ঘর। নেওয়ারের খাটে ওর বিশাল গুঁড়ির মত দেহটা পড়ে আছে, মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর সেটা ফুলে উঠছে জয়-

ঢাকের মত, তারপরই নাকের সুড়ঙ্গ দিয়ে আর বিরাট মুখ দিয়ে নানা-রকম শব্দ করে বাতাসটা বের হচ্ছে। সে এক বিরাট কাণ্ড।

ওপাশে ব্রহ্মবোধের ঘর। বারান্দায় চেয়ারগুলো পড়ে আছে। বাগানের ফুলে পাতায় তখন শিশিরের ঝকমকানি। বাতাস ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে রয়েছে। কয়নার জলধারার গুঞ্জরন সমানে চলেছে। শান্ত-সুন্দর সকাল। কিন্তু ওই দুটি জীবের আবির্ভাবে এই সুন্দর পরিবেশটাও বদলে গেছে।

ওদিকে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি মাথাটা নীচের দিকে করে লিকলিকে দুটো ঠ্যাং ওপরে তুলে দিয়ে ব্রহ্মবোধ এতক্ষণ শীর্ষাসন করছিল। আমাদের ভীতচকিত হয়ে চাইতে দেখে ডিগবাজি দিয়ে মেঝের উপর উঠে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে বলে—একটু যোগাভ্যাস করছিলাম। চাচাজী বলতেন—এসব করা ভালো। তবিয়ত ঠিক থাকে বাবুজী।

আণ্ডারওয়ার পরা লিকলিকে দেহটা—গলায় হলুদ রঙের এক গোছা ছাগল-দড়ির মত পৈতা ঝুলছে, তাতে একটা চাবি বাঁধা। খড়ম পায়ে দিয়ে একটা দাঁতন ঘষতে ঘষতে বের হয়ে এল মূর্তিমান অবধূত।

জবাব না দিয়ে চলে এলাম।

তখন এ ঘরে বীরবিক্রম সিং বিকট আওয়াজ করে আড়িমুড়ি ভেঙে হুংকার ছাড়ে—চা লাও। এ চৌকিদার আউর চারঠো আণ্ডা দে কর মামলেট বানাও। জ্যাদা করকে দুধ-চিনি দেকে চা। জলদি—

ওপাশের বারান্দায় চুপ করে বসে আছি। ভাবছি এখানে আর থাকা ঠিক হবে না মানুষের বিটকেলপনা দেখার হাত থেকে দিনকতক মুক্তি পাবো বলে বনবাসে এসেছি—এগুলো ভালো লাগছে না এখানে।

থল্‌কোবাদ না হয় ছোটনাগরার ফরেস্ট বাংলোর দিকেই চলে যাবো গাড়ি এলে। সঞ্জীবের গানও বন্ধ হয়ে গেছে।

ওপাশের বারান্দায় বীরবিক্রম ধরাচূড়া পরে তৈরী হয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। গোটা চার ছয় ডিমের মামলেট, খানছয়েক চাপাটি আর আলুর

ভাজি—সেই সঙ্গে এক মগ চা। আর ব্রহ্মবোধ ওপাশে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে একটা কাঁসার কানাউঁচু থালায় আধসেরটাক ভিজে ছোলা, একচাপ আখের গুড়, খানিকটা আদাকুঁচি আর কাঁচা হলুদের কুঁচি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। এরপর একপোটাক ভঁইসা দুধ গিলে উনিও বোধহয় বনপর্বতে বের হবেন বাইসন হাতির সন্ধানে।

বীরবিক্রমের ডিমের গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই ব্রহ্মবোধের মত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নাকে রুমাল চাপা দিয়ে গবাগব ছোলা চিবুচ্ছে।

সঞ্জীব বলে—অতগুলো ধরবে কোথায় দাদা ?

জবাব দিই—চিমনির নল হে, আগাগোড়া ফাঁপা ওর।

দুজনে দুদিকে বের হয়ে যেতে বাংলোয় যেন শান্তি ফিরে আসে। সামনের ক্ষেতে চাষ দিচ্ছে আদিবাসীরা। বোধহর ফসল বুনবে। সবুজ উর্বর জমি, লালচে রঙের মাটিতে ওরা লাঙল দিয়ে চলেছে। কয়না নদীর শব্দটা জেগে থাকে। বাতাসে শনশন শব্দ ওঠে। সুন্দর ছবির মত পরিবেশ, চারদিকের বন পাহাড়ে দিনের সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

বেলা হয়ে আসে। হঠাৎ দুই মূর্তির আবির্ভাবে জায়গাটার শান্ত রূপ বদলে যায়। বীরবিক্রম ঢুকছে, পরনে ব্রিচেস—কাঁধে রাইফেল—হাল্টিং সুু, এদিকে ঝুলছে ওয়াটার বট্‌ল ফ্লাস্ক। গরমে রোদে ঘামছে গলগল করে—আর সিঁটকে ব্রহ্মবোধ ঢুকছে বেগুন ক্ষেতের কাক-তাড়ানো খড়ের মূর্তির মত। লকলক করছে পা দুটো—জামাটা ঢলঢল করছে। কাঁধের বন্দুকের ভারে টলছে, মাথায় একটা টুপি। ওটা খুলে হাওয়া খেতে খেতে আসছে—আর টিকিটা উড়ছে হাওয়ায় বকের মাথার চৈতনের মত।

বীরবিক্রম জানায়—স্রেফ একমিনিটকা লিয়ে সব চলা গিয়া।

ধমকে ওঠে ব্রহ্মবোধ—আরে হামারা ডরসে উ ভাগ গিয়া। নেহি তো এক গোলিসে উস্‌কো উড়া দেতা থা।

বীরবিক্রম বলে—হম তো উস্‌কো মারতা থা। বাইসন ক্যা মামুলী শিকার।

আপ্‌সে ওঠে ব্রহ্মবোধ—চাচাজীসে উয়ো শিকার নেহি শিখা তব তো আজই খতম্ কর দেতা থা।

আবার সেই চাচাজীর কাহিনী আসতেই বীরবিক্রম গর্জে ওঠে—চাচাজী! তেরা চাচাজী ক্যায়সা শিকারী থা রে? মেরা চাচাজী ক্যায়সা গোলি চালাতা জানতা হ্যায়?

আবার সেই ঝগড়া শুরু হয়েছে। ওটা কেউই কিছুই দেখেনি, এটা বুঝতে পারি। বীরবিক্রমকে সে কথা বলে লাভ নেই। ওদিকে ব্রহ্মবোধের মত অবোধ নির্বোধ জীবকেও বাধা দেওয়া বৃথা।

বীরবিক্রম হেঁড়ে গলায় জাহির করছে তার চাচাজীর শিকারের বিজয়-কাহিনী—হাতি মারতা থা মেরে চাচা হম্‌ভি সাথ সাথ থা। হাতি দেখা জঙ্গলমে, চাচাজী বোলায়া—ভা—তি—জা। হম্ জবাব দিয়ে—চাচা!

—বন্দুক লাও!

অবাক্ হয়ে শুনছি ওর কাহিনী। বনের মধ্যে বুনো হাতির সামনে খুড়ো-ভাইপোর সংলাপ প্রলাপ চলছে। বন্দুক এগিয়ে দিল যোগ্য ভাইপো শিকারী কাকার হাতে। বীরবিক্রম দম নিয়ে শোনায়—চাচাজী গোলি করল। দন্ ন্! ব্যস্। চ র র র—

ঠিক বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। তাই শুধোলাম বীরবিক্রমকে—তারপর! বীরবিক্রম তুচ্ছ অবজ্ঞার হাসি হেসে যেন দয়া করেই পরের ঘটনাটা জানাল—বাবুজী! গোলি হাতির শরীরে ইধার সে উধারতক্ পুরা ফাড়্‌কে নিকাল গিয়া। একঠো হাতি দো টুকরা হো কর গিরে পড়ল।

—এঁ্যা! চমকে উঠি। এমন গুলির কথাও শুনিনি, আর এমন জব্বর শিকারীর কথাও জানা ছিল না। তাই বলি—হাতি স্রেফ দুখণ্ড হয়ে গেল? তাজ্জব!

—জী। বীরবিক্রম বিজয়ীর হাসি হেসে একবার ব্রহ্মবোধের দিকে চাইল। ও যেন জিতে গেছে।

ব্রহ্মবোধ হঠাৎ খিকখিক করে হাসতে থাকে। বীরবিক্রম চটে ওঠে।—কা!

ব্রহ্মবোধকে যেন পিষে চেপটে দেবে ওর এই অভদ্র হাসি দিয়ে ব্যঙ্গ করার জন্য।

ব্রহ্মবোধ শোনায়—মেরা চাচাজীর কাহিনী তো শুনিয়ে বাবুজী। পিছু বলবেন ক্যায়সা শাহী শিকারী থা। আরে তুম্ ভি শুনো বিক্রম।

দম নিয়ে ব্রহ্মবোধ শুরু করে।

—মেরা চাচাকা এক মুন্সী থা।

ব্রহ্মবোধ শুনিয়ে চলেছে, তাদের অঞ্চলে নাকি এখনও দারুণ বনজঙ্গল রয়েছে। আর বন্যপ্রাণী ওই হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক এসবের উৎপাতও লেগে থাকে। সারা এলাকায় এমন দিন যায় না যে কোন বসতিতে—কোনও বনে দু চারটে করে মানুষ গরু মোষ মারা না পড়ে।

সারা এলাকার লোক প্রতিদিন কোনও বসতি, কোনও বন থেকে আসে সেই সব নালিশ করতে। আর ওই সব ঘটনা রোজ গড়ে আট দশটা করেই ঘটে। তারই ফিরিস্তি রাখার জন্য ওর চাচাজীকে একজন সেক্রেটারি রাখতে হয়েছিল।

ব্রহ্মবোধ চিনচিনে গলায় রগ ফুলিয়ে বীরদর্পে তার চাচাজীর শিকার কাহিনী বলে চলেছে।

—আদমী লোক আতা হ্যায়—কিস্কা ভাইকো শের নে মার দিয়া, কিস্কা ক্ষেতি তছনছ কর্ দিয়া বুনো হাতিনে, কিস্ আদমীকা কৌন্ ভালুক একদম ফাড় দিয়া—কাঁহা বাইসন্ কিস্কো শিং দেকে মারা। মুন্শী খাতামে সব গাঁও কা বস্তিকা বনকা নাম, আউর কৌন কৌন জানোয়ার নে মারা সব লিখ লিয়া।

আমি শুধোই—তোমার কাকা তখন কোথায়?

হাসল ব্রহ্মবোধ।—রহস্যময় হাসি। সেই হাসি থামিয়ে জানায়—পূজা পাঠ করতেহেঁ। যোগ জানতা? চাচাজী বহুত বড়া যোগী থা। দিনভোর আদমী-লোক রোতে রোতে আতা। মুন্শী সবকা পাতা লিখ্ লিয়া। পিছু বৈকাল মে চাচাজীকা সব খবর শুনায়েগা। চাচাজী সব শুন্ লিয়া।

ওর কথাগুলো বলার ভাবও বিচিত্র। চোখের সামনে ছবিটা ফুটে ওঠে। মুন্‌শী চোখে দড়ি বাঁধা চশমা লাগিয়ে চাচাজীকে শুনিয়ে চলেছে। অমুক বস্‌তিতে হাতির উৎপাত, অমুক জায়গায় বাঘে মানুষ মেরেছে, অমুক পাহাড়ে ভালুক দুটো লোককে মেরেছে—সব ফর্দ পড়া হয়ে যেতেই চাচাজী হুংকার দিয়ে উঠলেন—ভাতিজা!

ব্রহ্মবোধ বলে চলেছে—আ গিয়া চাচাজী!

চাচাজীর তখন চোখ জ্বলতা হ্যায়। তেজসে সারা বদন ভর গিয়া।

চাচাজী বোলা স্রেফ দু বাত্—বন্দুক লাও!

আমি শুধোই—একসঙ্গে এতগুলো বন পাহাড় বস্‌তিতে যাবেন কি করে?

হাসল ব্রহ্মবোধ। বলে—শুনিয়ে তো বাবুজী। বন্দুক লে কর্ চাচাজী ঘর্‌কা উঠানমে পুরব মুখ হো কর্ খাড়া হয়ে গোলি চালানে শুরু কর্ দিয়া। দন্-ন্—দ-ন্-ন্—দ-ন্-ন্! দ-ন্-ন্—ন্। যিতনা কেস্ হোগা—ব্যস্ উতনাই গোলি চালা কর্ বন্দুক ফিন্ হম্‌রা হাত্‌মে দেকর ঘরমে ঘুঁস যায়েগা।

দম নিয়ে ব্রহ্মবোধ কাহিনীর পূর্ণচ্ছেদ টানলো—ব্যস্। কিস্‌সা খতম।

অবাক্ হই—সে কি উপাধ্যায়জী! জন্তুজানোয়ার রইল কোন্ বনে—কোথায় কোন্ পাহাড়ে—দূর বসতিতে—আর বাড়ি থেকেই শিকার হয়ে গেল!

হাসছে ব্রহ্মবোধ। জানায়—যোগ আর তেজসে সব হোতা হ্যায় বাবুজী। যাহাঁ যাহাঁ থা উসব জানোয়ার—সব বিল্‌কুল্ খতম্ হো গিয়া গোলিসে!

পরম বিজ্ঞের মত বলে—ইলেকট্রনিক্ রকেট জানতা হ্যায়? কাঁহা রাশিয়া কাঁহা চাঁদ! সব কিছু হিঁয়াসে হোতা! তব্ বন্‌কা জানোয়ার ঘর্‌সে খতম্ কেন হোবে না বাবুজী? সব যোগ আর তেজসে হোতা। চাচাজী ওসব গোলিকো 'রকেট' বানা দিয়া। শোচিয়ে ক্যায়সা জব্বর শিকারী থা মেরা চাচাজী। উন্‌কা সুযোগ্য ভাতিজা—

অবাক হই ! পাগলের পাল্লাতেই পড়েছি বলে মনে হয়। এবার পাগল আবার নাচতে না শুরু করে।

হঠাৎ একটা অস্ফুট গর্জনের শব্দে চাইলাম। বনের দিক থেকে এই দুপুরের রোদে মাঠ পার হয়ে একটা মোষ চারপায়ে লাফ দিয়ে গাঁ-ও-ক্ গাঁ-ও-ক্ শব্দে গর্জন করতে করতে বাংলোর লনের দিকে ছুটে আসছে।

চমকে উঠি। সঞ্জীব আমার হাত ধরে বারান্দায় টেনে তুলে বলে —বনের সেই খ্যাপা বাইসনটা নয়তো দাদা ? ওর মূর্তি দেখেছেন ?

বিরাট কালো পাথরের স্তূপের মত দেহ—চোখ দুটো লাল টকটকে —আর তেমনি শিং বাগিয়ে এই দিকেই তেড়ে আসছে। আর গর্জন করছে—গাঁ-ও-ক্ গাঁ-ও-ক্ !

বলবার চেষ্টা করি ওই দুই জব্বর শিকারীকে যাতে ওরা ওটাকে থামাতে পারে। হাঁক পাড়ি—বীরবিক্রমজী, ব্রহ্মবোধজী !

কিন্তু কোথায় তারা ? চক্কর-বক্কর জামাপরা বীরবিক্রমই সামনের দিকে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। গলায় ঝোলানো ক্যামেরা, ফ্লাস্ক, ওয়াটার বটল সব জড়াজড়ি হয়ে গেছে, তবু দৌড়চ্ছে প্রাণপণে। রাইফেলটা তার আগেই ফেলে দিয়েছে বিক্রম—চলেছে সামনের দিকে। চমকে উঠি, টিলাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে কয়না নদীর দিকে। সেই ঢালের মুখেই বীরবিক্রম পিছলে পড়েছে আর পড়ামাত্রই ওর ওই ভারী দেহটা পিপের মত গড়াচ্ছে, গড়িয়ে চলেছে নীচের নদীর জলের দিকে। অস্ফুট আর্তনাদ করছে সে। ভেবেছিলাম যখন এক শিকারী বিপদে পড়েছে অন্য শিকারী তখন নিশ্চয় এগিয়ে আসবে। কিন্তু ব্রহ্মবোধ সত্যিই এতো নির্বোধ নয়।

এই গোলমালে সে যেন কর্পূরের মত উবে গেছে, কোথাও তার টিকিটিও দেখা যায় না। লোকটা যেন যোগবলে বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

মোষটা কিন্তু বিক্রমের ওই কুমড়োগড়ান দেওয়া বপুর দিকে না চেয়ে সটান গিয়ে কয়না নদীর জলে পড়ে সারা গা ডুবিয়ে নাকটুকু জাগিয়ে পরম আরামে নিঃশ্বাস ছাড়ছে—ফোঁ-ও-স্।

ততক্ষণে মোষের মালিক একজন আদিবাসী ও ব্যাপারটা দেখে বাংলোয় এসেছে মোষটাকে সামলাবার জন্য। কাঁচুমাচু হয়ে জানায় সে। এতক্ষণ রোদে লাঙল টেনেছিল মোষটা, শরীর গরম হয়ে যেতে জলের দিকে ছুটেছিল সাব্। উ সাব্লোক কাহে এত্না ডরিয়ে গেলেন।

বীরবিক্রম ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, জামাটা ছিঁড়ে গেছে—হাঁটু কনুই দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, হাঁপাচ্ছে ওর বিশাল জয়ঢাকের মত দেহটা। আর ব্রহ্মবোধকে খুঁজে পাওয়া গেল একটা গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে ওর ছাগলদাড়ির মত মোটা পৈতা হাতে বিড়বিড় করে গায়ত্রী জপ করে চলেছে।

দু'জনকে ওরা ধরে-টরে এনে বাংলোর বারান্দায় গচ্ছিত করলো। চিঁ চিঁ করছে ব্রহ্মবোধ—থোড়া জল! জল!

দুই মূর্তিকে ঘরে পৌঁছে দিলাম। সেই দিনটা থেকে পরদিন সকালেই তারা ফিরে গেল, অবশ্য যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ আর দুই খ্যাতিমান কাকার দুই সুযোগ্য ভাইপোদের কোন সাড়াশব্দ শুনিনি।

ওরা চলে যেতে সঞ্জীব সেই মোষওয়ালা আদিবাসীকে দুটো টাকা বকশিশ দিয়ে জানায়—প্ল্যানটা বাধ্য হয়ে করেছিলাম দাদা। বড্ড জ্বালাতন করছিল ওরা। বলে কিনা ওরা রকেট শিকারীর ভাইপো!

বাকী ক'টা দিন বেশ নিরিবিলিতে ছিলাম ওই ফরেস্ট বাংলোয়।

ঘুম নিয়ে তেঁতুলমামার ঘুম নেই !

হিমানীশ গোস্বামী

সামু সেদিন চমৎকার পোলাও রান্না করেছে সয়াবিনের গুঁড়ো আর সবুজ বিন দিয়ে, সঙ্গে কারিপাতার চমৎকার সুগন্ধ। সঙ্গে তৈরি হয়েছে চিলি-চিকেন। রোস্ট করা চিকেনের সঙ্গে তেমন ঝাল নয় এমন লঙ্কা ঘিয়ে ভেজে টমাটো আর বড় সবুজ প্যাপরিকার সঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলসে বসে বসে হাই তুলছে। তোমরা যারা আলসেকে চেন না তাদের চিনিয়ে দিই—আলসে হল তেঁতুলমামার পোষা কুকুর—বিরাট চেহারার আলসেশিয়ান। ওকে আদর করে ডাকা হয় আলসে বলে। আলসে প্রায়ই হাই তোলে। তাকে নিয়ে পার্কে সকালে এবং বিকেলে যাওয়া হয়। কখনো কখনো গড়ের মাঠেও। সেখানে খুব দৌড়াদৌড়ি করে সে ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে এসে সে বিশেষ ছোটাছুটিতে আগ্রহ দেখায় না। তার নেশা আছে—বহুদিন থেকে সে গড়গড়ায় তামাক খেতে শিখেছে। আবার পানও মাঝে মাঝে খায়—কিন্তু জরদা না থাকলে সে পান ছোঁয় না পর্যন্ত। তাও আবার ভাল জাতের জরদা তার চাই।

তেঁতুলমামার সংসারে আর একজন সম্প্রতি এসেছে। এ হল একটা বেড়াল, নাম পুরন্দর আচার্য। এই বেড়ালটা নেহাতই দিশী কিন্তু তার অসাধারণ প্রতিভা। এ যে কত কথার উত্তর এই বয়সে দিতে পারে তাতে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সম্প্রতি সামু জানতে পেরেছে পুরন্দর 'এক' এই কথাটার ইংরিজী খুব সঠিক ভাবেই দিতে পারে। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এক-এর ইংরিজী কি? সে

ঠিক বলবে—ওয়ান ! তাছাড়া আরও একটা প্রশ্নের উত্তর সে সম্প্রতি দিচ্ছে। প্রশ্ন হল—বেড়াল কেমন করে ডাকে ? পুরন্দর উত্তর দেয় —হঁয়াও ! এরকম বুদ্ধিমান বেড়াল এ জগতে আর নেই বলে তেঁতুল-মামা এবং সামু মনে করে। বেড়ালটার ব্যবহারও চমৎকার। সব সময়ে সে যে মাছই পছন্দ করে তাও নয়। কখনো কখনো সে ঝাল বড়ি ভাজা খায়, আর পাকা কুমড়ো তার ভারি পছন্দ। আবার কুমড়ো বা লাউ-এর পাতাও মাঝে মাঝে চিবোয়। ঘরর্ ঘরর্ করে জানিয়ে দেয় সে যখন খুসি হয়। তা ছাড়া আলসেকে দেখে সে এবং তাকে দেখে আলসে প্রথম প্রথম ভয় পেলেও এখন তাদের মধ্যে হরিহর-আত্মা। অনেক সময়েই দেখা যায় পুরন্দর আলসের গা চেটে দিচ্ছে। আবার আলসেও পুরন্দরের গা মাথা চেটে দেয়। তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক খুবই ভাল। তবে মাঝে মাঝে পুরন্দর যখন দুষ্টুমি করে আলসের ল্যাজ নিয়ে খেলতে খেলতে কামড়ে দেয় তখন আলসে কখনও কখনও বিরক্ত হয়। কিন্তু মেনে নেয়। যাই হোক—ওদের কথা বলতে বসিনি আজ। পরে কোনো এক সময়ে ওদের কথা বলা যাবে।

কী যেন বলছিলাম ? হ্যাঁ, সামু সেদিন চমৎকার পোলাও রান্না করেছে। সামুর রান্না এত ভাল যে ওর রান্না পান্তা ভাতও চমৎকার বলে মনে হয়। অবশ্য তোমরা বলবে পান্তা ভাত আবার কেমন করে রান্না করে ? ভাতে জল দিয়ে সারারাত রেখে দিলেই তো পান্তা ভাত হয়ে যায়। কিন্তু তাই কি ? যেদিন পান্তা ভাত হবে তার আগের দিন রান্নার সময় হিসেব করে চাল বেশি নিতে হবে না ? তা ছাড়া, কেবল কি পান্তা ভাত হলেই হয়ে যায় নাকি ? ওর সঙ্গে চাই না কাঁচাপেঁয়াজ, শসা, কাসুন্দি, আর শুকনো লঙ্কা ভাজা ? আর অবশ্যই আঁচে শুকিয়ে আনা বাসি ডাল। সঙ্গে আরও চাই তেমন ঝাল নয় এমন টাটকা কাঁচা লঙ্কা।

ভাল পান্তা ভাত কেমন করে করতে হয় তা শিখতে হলে সামুর কাছেই আসা উচিত. কেননা, পান্তা রান্নার কথা কোনো রান্নার বইতেই পাওয়া যাবে না।

যাই হোক—সেদিন পোলাও সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তেঁতুলমামার সামনে। সঙ্গে রয়েছে চিলি-চিকেন। কিন্তু তেঁতুলমামার যেন খাদ্যে তেমন উৎসাহ নেই। তিনি দু এক চামচ পোলাও আর এক টুকরো চিলি-চিকেন খেয়েই উঠে পড়লেন। সামু বলল, রান্না কি খুব খারাপ হয়েছে? তেঁতুলমামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, না—তোমার রান্না কখনো খারাপ হতে পারে? আপনার কি তাহলে শরীর খারাপ? না, একদম খারাপ নয়। বেশ ভালই আছি আমি। বলে তাঁর হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে দেখালেন। তাহলে আপনি কি রাগ করেছেন? কেন আমি রাগ করব? তেঁতুলমামা বললেন—আর কার উপরই বা রাগ করব?

—তাহলে? সামুর প্রশ্ন।

—আমি একটা কথা ভাবছিলাম। সেই যে একবার কথা হল না লোকেদের ঘুম যদি আস্তে আস্তে কমিয়ে দেওয়া যায়। ধরো প্রতিটি লোক রোজ গড়ে ঘুমায় আট ঘণ্টা করে, এ থেকে যদি এক ঘণ্টা ঘুম রোজ কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কারুর ক্ষতি হবে?

সামু কথাটা নিয়ে ভাবল। কিন্তু তার ভাল কিংবা মন্দ কিছু মনে হল না। সে বলল, কে জানে। আমার তো সারারাত প্রায় ঘুমই হয় না বলতে গেলে।

—অথচ তুমি বেশ সুস্থ আছো! তবে তুমি একেবারেই ঘুমোও না তা ঠিক নয়। তোমার মনে হয় ঘুম হয় না কারণ হয়ত কয়েকবার তোমার ঘুম ভাঙে। তবে পুরো জেগে ওঠ না নিশ্চয়।

—না। কেমন আচ্ছন্ন একটা ভাব।

—ওটা কোনো ভিটামিনের অভাব। ব্যাপার কি জানো সামু, তোমার ঠিকমত পুষ্টি হচ্ছে না। হজমেরও গোলমাল হতে পারে।

—ঠিক ধরেছেন। সামু বলল—আমার হজমের গোলমাল হচ্ছে বলে মনে হয়। সে জন্যই ঐ রকম ঘুম হয় না।

তেঁতুলমামা বললেন, একটা জিনিস বৈজ্ঞানিকেরা ধরে ফেলেছেন, সেটা হল সব মানুষের একই পরিমাণে ঘুমের দরকার হয় না। ঘুম ব্যাপারটাই বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। এখনও

তা নিয়ে কত রকম গবেষণা চলছে তার ইয়ত্তা নেই। যাই হোক, দেখা গেছে কোনো মানুষ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা ঘুমোলেই যথেষ্ট হয়। আবার কেউ কেউ ন-দশ ঘণ্টাও ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। আবার এও দেখা গেছে ঘুমোলে ক্লান্তি দূর হয়। কিন্তু তা ঠিকমত ঘুমোলে। যদি কেউ নির্দিষ্ট সময়ের চাইতেও বেশী ঘুমায় তাহলে কিন্তু আবার তার শরীরে অক্সিজেন কমে যেতে থাকে, ফলে আরও ক্লান্ত হতে থাকে। আরও ঘুমোতে ইচ্ছে করে তার। সামু কি বুঝল কে জানে। সে বলল —তাই? তেঁতুলমামা বললেন—হ্যাঁ, তাই। তবে এও দেখা গেছে, যারা আট ঘণ্টা ঘুমোয় তারা সাত ঘণ্টা ঘুমোলেও কিছু তেমন এসে যায় না। ওটা কেবল অভ্যেসের ব্যাপার।

সামু ঘাড় নাড়ল।

তেঁতুলমামা বললেন—জগতে যারা কাজের মানুষ তারা যদি রোজ এক ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় পেয়ে যায় তাহলে কত সুবিধে। আমি অবশ্য ধরে নিচ্ছি মানুষ মাত্রেই কাজের।

—মানুষ মাত্রেই কাজের? কথাটা উচ্চারণ করে সামু চুপ করল।

—কেন, আপত্তি আছে নাকি কথাটায়?

সামু বলল—তাহলে বেকারদেরও কাজের মানুষদের দলে ধরে নিতে হয়—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

—কথাটা বলেছ ভাল। তেঁতুলমামা বললেন। কথাটা মন্দ বলনি। হ্যাঁ, কাজের লোক আর বেকার এরা দুরকমের হলেও এরা দুরকম কাজ করে। ধরো সব কাজের লোকই তো আর সব সময় কাজ করে না। তারাও বিশ্রাম নেয়, আড্ডা মারে, ছুটিতে বেড়াতে যায়। আবার দেখ সব বেকারই যে একেবারে সব সময়েই কিছু করছে না তাও ত নয়। তাদের অনেকেই বাজার করে, রেশন আনে, বাড়ি পাহারা দেয়। চাকরি খোঁজে—।

—কিন্তু চাকরি খোঁজটা কি একটা কাজ হল?

—কেন, বেকারের কাজই তো চাকরি খোঁজা। মানে অধিকাংশ বেকারেরই সেই কাজ।

সামু কথাটা মেনে নেয় বটে কিন্তু মনটা তার খুঁত খুঁত করতেই থাকে। তেঁতুলমামা বললেন—এই পৃথিবীতে এখন মানুষের সংখ্যা জানো ?

—উঁহু ! সামু বলল, তবে খুব যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—আমারও সংখ্যাটা তেমন জানা নেই। তবে শ চারেক কোটি হবে। না হলেও শিগগীরই হবে। এখন এর মধ্যে একশো কোটি লোককে যদি আমরা বাদ দিই।

—বাদ ? বাদ দেব কেন ?

—অতি বৃদ্ধ, শিশু, পঙ্গু—অসুস্থ, এদের বাদ দিতে চাই আমি হিসেব থেকে।

—বেশ। ওদের বাদ দেওয়াই ভাল।

—তাহলে, তেঁতুলমামা বললেন, বাকি রইল তিনশ কোটি লোক। এখন এরা ঘুমোয় গড়ে চব্বিশ ঘণ্টায় আট ঘণ্টা। আমি যদি এমন একটা কৌশল বার করি যাতে একজন লোকের সাত ঘণ্টা ঘুমোলেই চলে যায় তাহলে লোক প্রতি পেয়ে যাচ্ছি আমরা এক ঘণ্টা। অর্থাৎ কিনা সময় বাঁচবে প্রতিদিন তিনশ কোটি ঘণ্টা !

—অতবড় হিসেব আমার মাথায় ঢুকছে না। সামু বলল।

—ঢুকছে না ?

—না।

—আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। একজন লোক ২৪ ঘণ্টায় জেগে থাকে সতের ঘণ্টা। তাহলে এই যে তিনশ কোটি ঘণ্টা অতিরিক্ত পাওয়া গেল তা থেকে আমরা পাচ্ছি প্রতি সতের ঘণ্টার বিনিময়ে একটি করে মানুষ। পুরো হিসেব করলে পাচ্ছি সতের কোটি চৌষট্টি লক্ষ অতিরিক্ত মানুষ। এটা একদিনের হিসেব—তার মানে আমরা প্রতি দিনই এই এতগুলি অতিরিক্ত মানুষ পেয়ে যাচ্ছি। এদের দিয়ে কত কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

—অতিরিক্ত মানুষ ত সত্যি সত্যি পাচ্ছি না। সামু বলল !

—ঠিক কথা। তেঁতুলমামা বললেন—এই অতিরিক্ত মানুষ আমরা সত্যি সত্যি পাচ্ছি না। তবে প্রতি মানুষ এক ঘণ্টা করে সময় বেশি জেগে থাকার ফলে এই এতগুলি মানুষের অতিরিক্ত কাজকর্ম আমরা পেয়ে যাচ্ছি। অথচ এদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হচ্ছে না, অতিরিক্ত পোষাকের প্রয়োজন হচ্ছে না, কত লোকের সুবিধে পাওয়া গেল, কেমন চমৎকার, তাই না ?

—খুব ঠিক কথা। সামু বলল।

—কিন্তু একটা মুসকিল আছে। তেঁতুলমামা বললেন, আর সেটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

—এর মধ্যে আবার মুসকিলও আছে নাকি ?

তেঁতুলমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন, মুসকিল বলে মুসকিল ? এর ফলে পৃথিবীতে নানা অতিরিক্ত ঝামেলার সৃষ্টি হবে।

—তাহলে এরকম কাজ করবেন না আপনি। লোকদের ঘুম কমিয়ে দেবেন না।

—কিন্তু তুমি তো জিজ্ঞেসই করলে না কী ঝামেলা হবে।

—কী দরকার ? সামু দার্শনিকের মত বলল। আপনার কথাই আমি মেনে নিলাম।

—উহুঁ। তেঁতুলমামা বললেন। বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে কোনো কথা মেনে নেওয়া কি উচিত ?

সামু বলল, তবে যে লোকে বলে—মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে···।

তেঁতুলমামা থামিয়ে দিয়ে বললেন, থামো। ওসব কথা বলে আমাকে বিভ্রান্ত করো না। আসল কথা, যে যাই বলুন না কেন সেটাকে মেনে নেওয়ার আগে নিজে বুঝে নিতে হবে ত ? আমি যেই বললাম অতিরিক্ত ঝামেলার সৃষ্টি হবে আর তুমি তক্ষুনি তা মেনে নিলে ?

—বাঃ আপনার কথা মানব না ?

—মানবে। নিশ্চয়ই মানবে। তেঁতুলমামা বলেন। এবার তোমাকে আমি বলি ঝামেলাটা কোথায়। পৃথিবীতে ধরো তিনশো কোটি লোকের

মধ্যে দু কোটি চোর, পঞ্চাশ লাখ ডাকাত, দশ লাখ খুনে আছে, তাহলে ওরাও তো চুরি ডাকাতি খুন করার সময় বেশি পেয়ে যাবে না ?

—হুঁ, সামু বলল—আবার রাহাজানি আছে, পকেটমারা আছে, বাড়িতে আগুন দেওয়া আছে, রেল লাইনের ফিশ-প্লেট অপসারণ আছে, ছাত থেকে ফেলে দেওয়া আছে।

—তবে ? তেঁতুলমামা বললেন। ভালর সঙ্গে মন্দও এসে যাচ্ছে।

সামু বলল, তাহলে আর একটা কাজ করলে হয়। আচ্ছা, আপনি তো ঘুম কমাতে পারেন···।

তেঁতুলমামা বললেন, পারি বলছি না। ভাবছিলাম ঐ নিয়ে গবেষণা করলে কেমন হয়। গবেষণার সূত্রপাত অন্তত করে রাখা দরকার বলে আমার মনে হয়েছিল।

সামু বলল, তাহলে তো কিছুই শুরু করেননি। ভালই হল। ঘুম কমানোর দরকার কি ? ঘুম বরং প্রতি মানুষের জন্য এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দিন।

—বাড়িয়ে দেব ?

—দেবেন-ই যে তা বলছি না, ভেবে দেখতে পারেন তো !

—হুঁ। ঠিক বলেছ। তেঁতুলমামার মুখে চোখে যেন আলো খেলে গেল। ঠিকই বলেছ। লোকদের ঘুম বাড়িয়ে দিলে খুন জখম রাহাজানি এসব কমে যাবে। হ্যাঁ ঠিক বলেছ। ঐ নিয়েই গবেষণা করব।

—কিন্তু ! সামু বলল, যাঁরা দান ধ্যান করেন তাঁদেরও দান ধ্যানের সময় কমে যাবে। যে ডাক্তার বিনি পয়সায় চিকিৎসা করেন তিনি চিকিৎসার জন্য কম সময় পাবেন।

—তাই তো ! তেঁতুলমামা ভাবতে বসলেন। একটু পর বললেন —থাক ওসব চিন্তা ! তুমি বরং এক কাজ কর।

সামু উন্মুখ হল।

—তুমি আবার নিয়ে এসো ত এক বড় থালা ভর্তি পোলাও আর চিলি-চিকেন !

সামু খুশি হল কথা শুনে। আলসেও 'হো-য়া-উ' করে উঠল ! যার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—চমৎকার !

আলসে ভুরুক ভুরুক করে গড়গড়া টানতে লাগল।